বিদেশী ভূতের গল্প

সম্পাদনা ও ভাবানুবাদ
নান্টু গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ পুস্তকালয়
কলিকাতা - ৭৩

"BEDESHI BHUTER GALPA"

(a few ghost stories of Foreign writters)—

Edited and translated by

NANTU GANGOPADHYAYA.

প্রকাশক :

নারায়ণ বসাক

৩/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ :

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ :

মহালয়া—১৩৯৫

মূল্য : দশ টাকা

মুদ্রক :

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার দে

মঙ্গলচণ্ডী প্রিন্টার্স

৬৭/এ ডব্লু, সি, ব্যানার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

॥ উৎসর্গ ॥

শ্রদ্ধেয় সেজমাসি

শ্রীমতী নীলিমা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে—

ঃ ভূমিকা ঃ

ভূত সম্বন্ধে পৃথিবীর জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা বহুদিন আগে থেকে অনেক গবেষণা করে আসছেন। আজকের বিজ্ঞানের যুগেও তা অব্যাহত আছে। কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই নিত্য-নূতন ভৌতিক গল্প উপহার দিচ্ছেন সেখানকার প্রখ্যাত লেখকেরা। কেননা, ছেলে বুড়ো সকলেরই ভূতের গল্পের প্রতি সমান আগ্রহ। প্রায় সকলেরই রোমাঞ্চে গায়ে শিহরণ দেয়। কাজেই, ভূত সম্বন্ধে অযথা তর্ক না করে বিদেশী লেখকদের কয়েকটা শিহরণ জাগানো ভূতের গল্প নিয়ে বইটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। সময় কাটাবার জন্য বইটা কাজে লাগলে পরিশ্রম সার্থক হবে।

—নান্টু গঙ্গোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সজীব করোটি	৫
মরিচিকা	১৩
মৃত্যুর বিষাক্ত ছোঁয়া	২০
কঙ্কালের একটা হাত	৫৪
ভূতের ঔষুধ	৬১
অভিশপ্ত লণ্ডন-টাওয়ার	৮০
পিশাচ	৮৬
রাতের আগন্তুক	১০৬

সজীব করোটি

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

টেবিলের ওপর চক্চকে মানুষের একটা মাথার খুলি পড়ে আছে। তার পাশে শোয়ানো আছে কয়েকটা অস্থি।

টেবিলের পাশে সিঙ্গেল খাটে মেডিকেল কলেজের ছাত্র পিটার চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে।

ঘরের চারধারে হোস্টেলের মত কয়েকটা সিঙ্গেল চৌকি। প্রত্যেকটি চৌকির পাশে একটা করে ছোট টেবিল ও চেয়ার।

অন্যান্য ছাত্রাবাসের মত এই ছাত্রাবাসের ঘরটিও অগোছাল।

পুলিশ ইন্‌সপেক্টর জোন্স ছাত্রাবাসের আনাচে কানাচেতে সন্ধানী দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে পিটারের একজন রুমমেটকে প্রশ্ন করে, তারপর?

ছেলেটি ইতঃস্তত করে উত্তর দেয়, না, মানে, আজকের যুগেও সে এরকম ঘটতে পারে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি স্যার।

ইন্‌সপেক্টর জোন্স অধৈর্য্য হয়ে বলে ওঠে, অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, ঐ মরার খুলিটা রাত্রে টেবিলের ওপরে নড়াচড়া করে!

—আপনি সুস্থ আছেন তো?

—হ্যাঁ স্যার। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনার মত পিটারও আমাদের কথা বিশ্বাস করতো। হেসে উড়িয়ে দিত।

—আচ্ছা, গত রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন?

—আমি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম স্যার।

—কখন ফেরেন ?

—তা, ভোর পৌনে সাতটা হবে।

—ঘরে এসে কি দেখেন ?

—পিটার নিজের বিছানায় এখনকার মত শুয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, ও হয়ত ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে। ওকে জাগানো ঠিক নয়।

—ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে বলতে, কি বলতে চাইছেন ?

—পিটারের অনিদ্রা রোগ ছিল। তা ছাড়া, রাত জেগে পড়াশুনা করার অভ্যেসও ওর ছিল।

—তারপর ?

—বেশ সকাল হওয়ায় আমাদের অন্যান্য রুম মেটের সঙ্গে আমারও কি রকম যেন সন্দেহ হয়। আমরা ওর হাতের নাড়ি পরীক্ষা করি। দেখি নাড়ি বিকল! টেলিস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝতে পারি যে, ওর হার্টও কাজ করছে না! তবে ওর হার্টকে কে যেন জোর করে বন্ধ করেছে বলে আমাদের অনুমান হয়।

ইন্‌সপেক্টর জোন্স সহকারী পুলিস অফিসারের দিকে ব্যঙ্গের হাসি ছুঁড়ে দেয়। ঘরের চারপাশে পায়চারী করে। কিন্তু সন্দেহ-জনক কিছু খুঁজে পায় না।

এক সময়ে পিটারের কাছে আসে। টেবিল থেকে একটা হাড় তুলে নেয়। হাড়টা পরীক্ষা করে।

পরে পিটারের রুমমেটটিকে ভাল করে দেখে।

আস্তে আস্তে বলে, এই অদ্ভুত মাথার খুলি ও হাড়গুলো এখানে এলো কি করে ?

—ওগুলো পিটার কলেজের চীপ্ স্টোর থেকে কিনে এনেছিল। ওগুলো আমাদের ডাক্তারী পড়াতে লাগে।

ইন্‌সপেক্টর জোন্স নিজের অজান্তে যেন বলে ওঠে, অদ্ভুত, সবটাই অদ্ভুত ব্যাপার। কোন দিক দিয়ে বিশ্বাস করার উপায় নেই।

পিটারের রুমমেটরা ইন্সপেক্টর জোন্সের সগোক্তি শুনতে পায়।

বলে, ঠিক আপনার মত পিটারও মাথার খুলিটির চলাচল বিশ্বাস করত না। বেশী বললে ও খুলিটা ফেরৎ দেবার কথা বলতো।

ইন্সপেক্টর জোন্সের সহযোগী একজন পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করে, খুলিটা কি রোজই টেবিলের ওপরে চলাফেরা করে?

—হ্যাঁ, প্রতিদিন গভীর রাত্রে চলাফেরা করে। সে সময় মনে হয়, কে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনের উত্তাপকে প্রশোমিত করতে চাইছে।

পুলিশ অফিসারটি মাথার খুলিটা নিজের হাতের ওপরে বসায়।

খুলিটার ওপরে আঙ্গুল দিয়ে মৃদু আঘাত করে।

খুলির ভেতর থেকে টুং টাং শব্দ হয়।

ইন্সপেক্টর জোন্স প্রশ্ন করে, আচ্ছা, কতদিন আগে পিটার এই মাথার খুলিটা সংগ্রহ করেছে?

পিটারের একজন রুমমেট আমৃতা আমৃতা করে বলে, তা প্রায় একমাস হয়েছে।

ইন্সপেক্টর জোন্স সহকারী পুলিশ অফিসারের হাত থেকে মাথার খুলিটা নিজের হাতের চেটোর ওপর বসায়। পকেট থেকে রোমাল বের করে খুলিটাকে ভাল করে পরিষ্কার করে। মনোযোগ দিয়ে খুলিটাকে পরীক্ষা করে।

পরে আপন মনে বলে, খুলিটার প্রকৃত মালিক অনেকদিন ধরে এই পৃথিবীর বুকে বেঁচেছিল। আইজ্যাচ নিউটনের সমসাময়িক বললে ভুল হবে না। এই খুলিটা থেকে অনেক কিছু জানার আছে।

তারপরেই ইন্সপেক্টর জোন্স পিটারের মৃতদেহ পোষ্টমর্টমে পাঠাবার আদেশ দেয় সহকারী পুলিশ অফিসারকে।

নিজে ঘরটা আরও একবার ভাল করে পরীক্ষা করে।

ইন্সপেক্টর ঘর থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেও ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

পিটারের রুমমেটদের উদ্দেশ্য করে বলে, আমি থানায় যাচ্ছি। তবে আজকে গভীর রাতে আমি আমার সহকারী সমেত থাকতে চাই। এ বিষয়ে আপনাদের কোন আপত্তি নেই তো?

পিটারের রুমমেটরা সানন্দে ইন্সপেক্টর জোন্সের প্রস্তাবকে মেনে নেয়

ইন্সপেক্টর জোন্স পিটারদের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রাত ঠিক সোয়া এগারোটার সময় ইন্সপেক্টর জোন্স তার এক সহকারী পুলিশ অফিসারকে নিয়ে মেডিক্যাল হোষ্টেলে আসে।

এ সময় তারা সাধারণ পোষাক পরে এসেছিল।

ইন্সপেক্টর জোন্সের হাতে ছিল পাঁচ ব্যাটারীর একটা টর্চ।

মেডিক্যাল হোষ্টেলের ছাত্ররা ইন্সপেক্টর জোন্স ও তার সহযোগীকে স্বাগত জানায়। তাদের সঙ্গে পিটারের ঘরে রাত কাটাতে চায়।

ইন্সপেক্টর জোন্স রাজি হয় না।

সে সহকারী পুলিশ অফিসারটিকে নিয়ে পিটারের ঘরে ঢোকে। ভেতর থেকে পিটারের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। ভাল করে ঘরের জানালা ও দরজা পরীক্ষা করে।

না, সে রকম কিছু তার নজরে পড়ে না।

একবার সে নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকায়। ঘরের ইলেকট্রিক আলো বন্ধ করে দেয়।

ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তার আলো টেবিলের ওপরে রাখা খুলিটার ওপরে পড়ে। ঘরের ভেতরে বেশ একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়

ইন্সপেক্টর জোন্স সহকারী পুলিশ অফিসারটির কাছে যায়।

চাপা স্বরে বলে, প্রথম রাতটা আপনি খুলিটার ওপরে নজর

রাখবেন। এ সময় আমি একটু ঘুমিয়ে নেব। পরের রাতে আমি জেগে থাকবো। আপনি ঘুমুবেন।

সহকারী পুলিশ অফিসারটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

ইন্‌সপেক্টর জোন্স হাতের বড় টর্চ লাইটটা সহকারী পুলিশ অফিসারের হাতে দেয়। নিজে পায়ে পায়ে পিটারের চৌকিটার ওপরে বসে। চৌকিতে শুতে শুতে বলে, যদি কোন সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে, তা হলে আমাকে অতি অবশ্য ডাকবেন।

এবারও পুলিশ অফিসারটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। ইন্‌সপেক্টর জোন্সের চৌকির একপাশে পুলিশ অফিসারটি বসে। ঘরের চারদিকে ও খুলির ওপরে নজর রাখে।

ক্রমে রাত বাড়তে থাকে।

ছাত্রাবাসের সিঁড়িতে মানুষ চলাচলের শব্দ হয়।

কোথায় যেন ভারী কিছু সরানোর শব্দ ঘরের শ্মশানের নিঃস্তব্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।

এক সময়ে পুলিশ অফিসারের চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে।

রাস্তায় ভারী ট্রামের চলাচলে মেডিক্যাল ছাত্রাবাসটা কেঁপে ওঠে।

পুলিশ অফিসারটি সতর্ক হয়ে ওঠে।

এক সময় তার মনে পড়ে, যে চৌকিতে সে বসে আছে, সেই চৌকিতে একটি যুবকের হৃদ্‌স্পন্দন কে জেন জোর করে থামিয়ে দিয়েছে! সেই যুবকের আত্মা এখন কোথায় আছে, কে জানে?

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসারটির মনে হয়, টেবিলের ওপরকার খুলিটি টেবিল থেকে কিছুটা ওপরে উঠে শূন্যে ঝুলছে! খুলিটির দৃষ্টি যেন তাদের দিকে স্থির হয়ে আছে!

পুলিশ অফিসারটির মনে হয়, সে বোধ হয় তন্দ্রাছন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখছে।

তাই সে চৌকির ওপরে নড়ে চড়ে বসে।

সে নিজের চোখ হাতের চেটো দিয়ে ভাল করে ঘষে।

তবুও যেন মনে হয় খুলিটা সচল হয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে অজানা আতঙ্কে তার বুক কেঁপে ওঠে। কে যেন তার দম বন্ধ করতে চায়।

পুলিশ অফিসারটি সঙ্গে আনা রিভালভার বের করে। খুলিটার দিকে তাক করে। নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সেই অজানা আতঙ্ক তাকে স্থির থাকতে দেয় না। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ সে স্পষ্ট শুনতে পায়।

সে মরিয়া হয়ে ইন্সপেক্টর জোন্সকে ডাকতে চেষ্টা করে।

মুখ থেকে অদ্ভুত শব্দ বের হওয়া ছাড়া আর কিছুই বের হয় না তার।

নিরুপায় হয়ে সে অতি কষ্টে ইন্সপেক্টর জোন্সকে ধাক্কা দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর জোন্সের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

চাপা স্বরে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার?

পুলিশ অফিসারটিকে কোন কথা বলতে না দেখে সে পুলিশ অফিসারটিকে ধাক্কা দেয়।

ইন্সপেক্টর জোন্সের ধাক্কায় পুলিশ অফিসারটি নিজেকে আয়ত্বে আনতে পারে।

কোন রকমে বলে, খুলিটা স্যার।

—খুলিটা কি হয়েছে?

—মনে হল চলছে স্যার।

ইন্সপেক্টর জোন্স পুলিশ অফিসারের হাত থেকে টর্চটা নেয়। খুলিটার ওপরে টর্চের আলো ফেলে।

না, সে রকম কোন অস্বাভাবিকতা তার চোখে পড়ে না।

ইন্সপেক্টর জোন্স টর্চ বন্ধ করে। টর্চটা এবার নিজের কাছে রাখে।

ঘর ভর্তি আগেকার মত অন্ধকার নেমে আসে।

ইন্সপেক্টর জোন্স আগের মত চৌকির ওপরে শুয়ে পড়ে। রেডিয়াম লাগানো হাত ঘড়িতে দেখে তখন রাত দুটো।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আবার পুলিশ অফিসারটি ইন্সপেক্টর জোন্সকে ধাক্কা দেয়।

ফিস্ ফিস্ করে বলে, আবার স্যার।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌সপেক্টর জোন্স খুলির ওপরে টর্চের আলো ফেলে।

না, খুলিটিকে নড়তে চডতে দেখা যায় না।

তবুও ইন্‌সপেক্টর জোন্স হাতের টর্চ নেভায় না। টর্চের আলো খুলিটার ওপরে ফেলে রাখে।

এভাবে কিছুক্ষণ কেটে যায়।

এক সময় ইন্‌সপেক্টর জোন্স হাতের টর্চটা সহকারী পুলিশ অফিসারের হাতে দেয়।

ইন্‌সপেক্টর জোন্সের নির্দেশ মত সহকারী পুলিশ অফিসারটি টর্চের আলো খুলিটার ওপরে স্থির করে রাখে। পায়ে পায়ে ঘরের ইলেকট্রিক আলোর কাছে যায়।

ইন্‌সপেক্টর জোন্স চৌকি থেকে নিঃশব্দে নামে। টেবিলের ওপরে রাখা খুলিটার কাছে যায়।

ইন্‌সপেক্টর জোন্সের, নির্দেশ অনুসারে পুলিশ অফিসারটি ঘরের ইলেকট্রিক সুইচটা টেপে।

সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিকের আলো সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

এরই মধ্যে ইন্‌সপেক্টর জোন্স টেবিল থেকে খুলিটা তুলে নেয়।

ইন্‌সপেক্টর জোন্সের হাতে খুলিটা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

খুলিটা ভৌতিক উল্লাসে মেতে ওঠে।

ইন্‌সপেক্টর জোন্স ব্যাপারটা বোঝার আগেই তার দেহে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

সে খুলিটাকে ফেলে দিয়ে নিজেকে নিরাপদ করতে চেষ্টা করে।

অনেক চেষ্টা করেও খুলিটা সে ফেলতে পারে না।

ভয়ে তার শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। অদৃশ্য প্রেতাত্মা আড়ালে থেকে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে বলে তার ধারণা হয়।

অনেক চেষ্টা করেও ইন্‌সপেক্টর জোন্স এই রহস্যের সমাধান করতে পারে না। রহস্য রহস্যই থেকে যায়।

———

মরিচিকা

এডগার অ্যালান পো

সর্বগুণ সম্পন্না রোয়েনাকে বিয়ে করি।

বিয়ের একমাস আমাদের ভালই কাটে।

কিন্তু দ্বিতীয় মাসেই বিপর্য্যয় নেমে আসে। রোয়েনার কঠিন অসুখ হয়।

অধিকাংশ সময়ে সে জ্বরের প্রকোপে বেহুস হয়ে থাকে।

সব সময় সে যেন বিভিন্ন ভাষার কথোপকথন শুনতে পায়। খুব কাছ থেকে যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

রোয়েনা চম্‌কে ওঠে।

কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পায় না।

সে আপন মনে বিড় বিড় করে কি যেন কথা বলে !

অনেক চিকিৎসার পরে সে কখনও ভালর দিকে যায়।

পরের দিনই আবার সে আগের মত সাংঘাতিক জ্বরে জ্ঞান হারায়।

দিনটা ছিল সেপ্টেম্বর মাসের কোন এক রাত্রি।

রোয়েনা জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে নিজের কালো খাটে শুয়ে ছিল। আমি তার খাটের পাশে চুপ করে বসেছিলাম।

ভাবছিলাম, সদা হাস্যময়ী ও প্রাচুর্যে ভরপুর রোয়েনার এই অল্প দিনের জ্বরে তার চেহারাটা ঝোড়ো কাকের মত অবস্থা হয়েছে !

এক সময়ে হঠাৎ রোয়েনা চম্‌কে ওঠে।

দুর্ব্বল শরীর নিয়ে সে খাটের ওপরে কোন রকমে আধ শোয়া অবস্থায় বসে।

ভয়ে আমার দিকে সরে আসে। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে ঘরের চার দিকে তাকায়। কি যেন খোঁজে!

সঙ্গে সঙ্গে আমি রোয়েনাকে ধরে ফেলি।

প্রশ্ন করি, কি খুঁজছো রোয়েনা?

রোয়েনা বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে অল্প সময় তাকায়।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, একটু আগে কেউ কি এখানে এসেছিল?

—না তো, কেউ আসেনি।

—কিন্তু আমি যে তাদের কথা স্পষ্ট শুনেছি। ওরা যে আমার খাটের পাশেই ছিল।

আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলি, না, তুমি স্বপ্ন দেখেছো রোয়েনা এখন তো আমি ছাড়া কেউ আমার ঘরে ঢোকেনি। তাছাড়া কারও কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাইনি।

পরে রোয়েনার দৃষ্টি অনুসরণ করি।

বলি, বাতাসে ঘরের জানালা দরজার পর্দা নড়ছে বলে তোমার মনে হয়েছে, বাইরের কেউ ঘরে এসেছে।

আমার প্রবোধ বাক্যে রোয়েনার মন থেকে আতঙ্ক দূর হয় না। বরঞ্চ তা আরও বেড়ে যায়!

রোয়েনার অবস্থা দেখে আমি বিচলিত হই।

রোয়েনার দেহের স্নায়ুকে সতেজ করার জন্য অন্যঘরে ব্রাণ্ডির বোতল আনতে যাই। অবশ্য ব্রাণ্ডি দেওয়াটা ডাক্তারই নির্দেশ করেছিলেন।

পাশের ঘরে ধূপদানীর পাশে আমি একটা ফিকে ছায়ামূর্তি দেখতে পাই।

ভাল করে দেখার আগেই ছায়ামূর্তি যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়।

মনে হয় কিছু যেন আমার পাশ দিয়ে চলে গেল!

আমি ছায়ামূর্তিকে আমল দিই না। ব্রাণ্ডির বোতল ও গ্লাস

নিয়ে রোয়েনার বিছানার কাছে যাই গ্লাসে করে ব্রাণ্ডি অবচেতন রোয়েনার মুখের কাছে ধরি।

একটু ব্রাণ্ডি পান করে রোয়েনা নিজেকে সামলে নেয়। আমার হাত থেকে ব্রাণ্ডির গ্লাসটা নিজের হাতে নয়। অল্প অল্প করে পান করতে শুরু করে।

ঠিক সে সময়ে আমার মনে হয় জ্বল জ্বলে চারটে রক্তের মত লাল বিন্দু কোথা থেকে যেন এসে ব্রাণ্ডির গ্লাসের ভেতরে পড়ে।

ব্যাপারটা কিন্তু রোয়েনার নজরে পড়ে না। সে আস্তে আস্তে গ্লাসে চুমুক দেয়

একবার মনে হয় রোয়েনার হাত থেকে ব্রাণ্ডির গ্লাসটা নিয়ে নিই।

পরক্ষণে মনে হয়। হয়ত আমারই দেখতে ভুল হয়েছে। কেননা, বিগত কয়েকটা রাত জাগার ফলেই হয়ত আমার ভুলটা হয়েছে।

কিন্তু সেদিনের ব্রাণ্ডি পান করার পরেই রোয়েনার অসুখ কয়েকগুন বেড়ে যায়

এ ভাবে চলে আরও দুটো দিন।

তৃতীয় দিনে যম ও মানুষের টানাটানির পর রোয়েনা চিরদিনের মত আমাকে ছেড়ে চলে যায়।

আমি রোয়েনার খাটের পাশে পাথরের মত বসে থাকি। ভাবতে পারিনি রোয়েনা এভাবে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে!

এক সময়ে পাশের ঘরের ধূপদানির দিকে নজর পড়ে।

না, আজকে আর সেই ছায়া মূর্তি দেখতে পাই না।

মনে মনে স্বস্তি পাই।

কিন্তু রোয়েনার নিশ্চল দেহটার দিকে তাকিয়ে আমার মনের উত্তাপ সহস্রগুণ বেড়ে যায়। অতীতের অনেক মধুর কথা চোখের সামনে ভেসে ওঠে

আমারই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। আমি মুহূর্তের জন্য নিজেকে রোয়েনার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারি না।

এভাবে কতক্ষণ যে কেটে যায়, তা আমি বুঝতে পারি না।

তখন বোধ হয় মাঝ রাত্রি।

হঠাৎ আমি কারও চাপা কান্না ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনতে পাই।

আমার মনে হয়, সে কান্না ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস মৃত রোয়েনার কাছ থেকে এসেছে

আমি আরও মনযোগ সহকারে মৃত রোয়েনার দিকে তাকাই। দ্বিতীয়বার শোনার জন্য কান পেতে থাকি।

কিন্তু দ্বিতীয়বার আর শুনতে পাই না সবটাই মনের ভুল বলে মনে হয়।

আরও কিছুক্ষণ পরে রোয়েনার ফ্যাকাশে গাল দুটোয় রক্তের আভা থেকে যায় চোখের পাতাও প্রায় সচল হয়ে ওঠে!

ক্ষণিকের জন্য আমার মনে আনন্দের উদয় হলেও, পরক্ষণে অজানা এক আতঙ্ক আমার শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে চায়।

এ অবস্থায় মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আমি নিজেকে সজাগ করতে চেষ্টা করি।

রোয়েনার দিকে তাকিয়ে ভাবি, রোয়েনা নিশ্চয়ই পরপার থেকে ফিরে আসছে

এ সময় চাকর বাকররা নিজেদের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল।

তাদের ডাকতে গেলে রোয়েনাকে একলা রেখে যেতে হয়। এ সময় তা কোন মতিই সম্ভব নয়।

ফলে, রোয়ে[redacted]কে সতেজ করার জন্য আমি একলাই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকি।

আরও কিছুক্ষণ পরে আমার শত চেষ্টাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে

রোয়েনার দেহের সতেজ ভাব আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়। সে আগের মত ফ্যাকাশে দেহে পরিনত হয়।

আমার চোখে তা খুবই বীভৎস লাগে।

আমি হতাশ হয়ে রোয়েনার খাটের পাশে বসে পড়ি

আরও এক ঘণ্টা সময় কেটে যায়।

এবার স্পষ্ট শুনতে পাই খুবই ধীরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস

আমি রোয়েনার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ি।

দেখি, রোয়েনার পদ্মের পাপড়ির মত ঠোঁটজোড়া আস্তে আস্তে ফাঁক হল।

মুক্তোর মত সুন্দর দাঁতের পাটি দেখতে পাই

এবার আর আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। মনে হয়, আমি ভুল দেখছি, তা না হলে আমার মাথার গণ্ডোগোল হয়েছে।

আরও ভাল করে বোঝার জন্য আমি রোয়েনার ওপরে ঝুঁকি থাকি।

এবার স্পষ্ট দেখতে পাই, রোয়েনার পাণ্ডুর গালে লাল ছোপ লেগেছে। এই রঙ্ আস্তে আস্তে তার গলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

রোয়েনার গায়ে হাত দিয়ে দেখি, তার দেহে হিমঘরের ঠাণ্ডা ভাব নেই। সেখানে এসেছে উত্তাপ।

বুকে কান দিয়ে মনে হয় তার হৃদ্‌পিণ্ডও খুবই আস্তে আস্তে চলছে।

আমি মনের সব রকম চিন্তা ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দিই। রোয়েনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

ওর দেহে উত্তাপ আনার জন্য ওর হাতের চেটো ও পায়ের তলায় ঘসতে শুরু করি।

এ ছাড়াও রোয়েনার দেহে জীবনী শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নানান রকম চেষ্টা করতে পিছিয়ে যাই না

কিন্তু অল্প সময় পরেই আমি বুঝতে পারি, আমার সব রকম চেষ্টাকে নসাৎ করে রোয়েনা আগের মৃতের অবস্থায় ফিরে আসে।

রোয়েনার দেহ থেকে রক্তিমাভা নিরুদ্দেশ হয়। বিবর্ণ মুখে মৃত্যুর ভয়াল রূপ প্রকট হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর জমাট পাথরের মত হয়ে ওঠে।

আমি আবার হতাশ হয়ে উঠি। স্মৃতি রোমন্থন করি।

এভাবে একই রাত্রে কতবার যে রোয়েনার দেহে প্রাণশক্তির আভাষ ফুটে উঠেছে তার হিসেব নেই।

আমার মনে হয়েছে, রোয়েনার জীবনশক্তি তার ফেলে যাওয়া কায়ার মধ্যে ঢোকার বার বার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু অপরাজেয় মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয়ে বার বার তার কায়া পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

রাত্রি প্রায় শেষের দিকে হঠাৎ রোয়েনার মৃত দেহটা বেশ জোরে কয়েকবার নড়ে ওঠে।

এবার কিন্তু মৃত রোয়েনার দেহের সাড়া আমার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা, তখন আমি খুবই ক্লান্ত ছিলাম।

আমি ক্লান্ত দৃষ্টি নিয়ে রোয়েনার মৃত দেহের দিকে তাকিয়ে থাকি।

তারপরেই রোয়েনার মৃত দেহের পাণ্ডুরতা দূর হয়ে রক্তিম বর্ণ ফুটে ওঠে।

একমাত্র চোখ দুটো বন্ধ ছিল। তাছাড়া, রোয়েনার দেহটা জীবন্ত হয়।

আমার মনে আবার আনন্দের সঞ্চার হয়।

মনে হয়, এ যাত্রায় বোধ হয় রোয়েনা কঠিন মৃত্যুর অনুশাসন থেকে রেহাই পেয়েছে।

এবার রোয়েনা আমাকে নিরাশ করে না।

সে আস্তে আস্তে খাটের ওপরে উঠে বসে। ঘুমন্ত অবস্থায়

মানুষ যেমন চোখ রুদ্ধ করে খাট থেকে নামে, ঠিক সে রকম করে রোয়েনা নিজের খাট থেকে নামে। আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

এ হেন অবস্থায় আমার মাথা থেকে ভয় ভাব দূর হয়ে যায়।

এখন আমার যে কি করা উচিত, তা আমি বুঝতে পারি না। সব কিছু যেন তাল-গোল পাকিয়ে যায়।

আমি পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে খাটের এক কোণে বসে থাকি।

এক সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রোয়েনার দেহটা দেখে আমার যেন মনে হয়, মৃত্যুর পরে রোয়েনা কি কিছুটা লম্বা হয়েছে?

রোয়েনা চোখ বোজা অবস্থায় আস্তে আস্তে ঘরের অন্যদিকে যেতে থাকে।

আমি হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে রোয়েনার সামনে এসে দাঁড়াই। রোয়েনাকে ধরতে যাই।

রোয়েনা থমকে দাঁড়ায়।

একটা হাতের সামান্য ছোঁয়াতেই রোয়েনার দেহের ওপরকার সাদা কাপড়টা মাটিতে খসে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা বাতাস ঘরে প্রবেশ করে সব এলোমেলো করে দেয়।

ঘরে নেমে আসে রাত্রির নীরন্ধ্র অন্ধকার।

সে সময়ে রোয়েনার দুটো সুন্দর চোখ খুলে যায়। আমাকে ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করতে থাকে।

আমি ভয়ে ও বিস্ময়ে চিৎকার করে বলি, এবার আমি আমার হারানো রোয়েনাকে নূতন করে ফিরে পেয়েছি।

———

মৃত্যুর বিষাক্ত ছোঁয়া

ক্রিফ লিবারের

প্রচণ্ড বর্ষণ, আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে।

তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঘন ঘন বজ্রপাত।

ফলে, গাড়ী চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। যে কোন সময় পথের পাশের বড় বড় গাছগুলি ঝড়ের তাণ্ডবে হুড়মুড় করে গাড়ীর ওপরে পড়তে পারে।

এ হেন অবস্থায় সঙ্গী ও স্ত্রী হেলেন ভীষণ ভয় পায়। কোথাও আশ্রয় নিতে অনুরোধ করে।

অবশ্য হেলেনের সঙ্গে আমিও এক মত।

কেননা, এই প্রচণ্ড বর্ষায় পথে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়াটা অসম্ভব নয়।

বাবে কাছে আশ্রয় নেবার মত এমন কোন বাড়ীর কথা আমার মনে পড়ে না।

অনেক চিন্তা করার পর আমার বাল্য বন্ধু ম্যালকম ওরনের কথা মনে পড়ে। হেলেনও ম্যালকম ওরনদের চিনতো। কেননা, ম্যালকম ওরন ছিল অস্বাভাবিক বেঁটে। ও রকম খুব একটা দেখা যায় না।

ম্যালকম ওরনের কথা বলায় হেলেন আপত্তি করে।

কেন না, সে বেঁটে লোকদের একেবারে পছন্দ করে না।

আবার কাছাকাছি সে রকম আশ্রয় না থাকায় আমার অনুরোধে হেলেন ম্যালকম ওরনের বিরাট বাগান বাড়ীতে আজকের মত আশ্রয় নিতে রাজি হয়।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে অতি কষ্টে ম্যালকম ওরনদের পুরোনো বাগান বাড়ীর সামনে গাড়ীটা আনতে চেষ্টা করি।

পথের দুপাশে অযত্নে অনেক আগাছা জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে। বিরাট এলাকা নিয়ে ম্যালকম ওরনদের পূর্ব পুরুষের বাড়ী।

ভাল করে দেখা শুনা করার অভাবে বাড়ীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে এসেছে। অনেকটা ভূতের বাড়ী বলে মনে হয়।

তবুও বুকে সাহস এনে গাড়ী থেকে হেলেনকে নিয়ে নামি।

বাড়ীর সামনে ছোট্ট একটা গাড়ী বারান্দার নিচে দাঁড়াই। অন্ধকারে তেমন কিছু দেখতে পাই না।

তবে বাড়ীর সদর দরজার ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো দেখতে পাই।

এক সময় হেলেন ভয় পেয়ে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়।

আমি টর্চ ফেলে দেখি, বাড়ীর দোতলার বারান্দা থেকে একটা গাছের ডাল নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। ঝোড়ো বাতাসে ডালটা এদিক ওদিক করছে।

গাছের ডালটা সম্ভবত হেলেনের গায়ে লেগে থাকবে। তাই হেলেন ভয় পেয়েছে।

কিন্তু জীর্ণ এই বাড়ীর ভেতর থেকে কোন জন প্রাণীর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। বাড়ীটা যেন শ্মশান পুরী বলে মনে হয়।

এই দুর্যোগ রাতে এভাবে বাইরে থাকাটা সমুচিত মনে হয় না।

তাই বাড়ীর জীর্ণ বিরাট দরজাটায় হাত দিয়ে আঘাত করি। দরজা খুলতে অনুরোধ জানাই।

সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো দরজা থেকে কয়েকটা কাঠের টুকরো আমার দুপাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যায়।

আমি মরিয়া হয়ে বেশ জোরে দরজায় আঘাত করি।

এবার দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যায়। দরজার ফাঁক দিয়ে একজন মাঝ বয়সী নিগ্রো বেরিয়ে আসে।

নিগ্রোটার উস্‌খু খুস্‌খু চেহারা। দু চোখে বিশ্বের সব আতঙ্ক যেন জড়ো হয়েছে। সেজন্যই হয়ত সে হাতে একটা শটগান চেপে ধরে আছে। তখনও শট গানের মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

নিগ্রোটির দেহে মলিন বহু পুরোনো পোষাক।

নিগ্রোটি আমাদের দেখে একটু লজ্জিত হয়।

বলে, দরজার চারপাশের দেওয়ালের পলেস্তার খসে পড়ায় আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম স্যার।

আমি নিগ্রোটার পাশ দিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে যাই, আত্মরক্ষার জন্য যে কোন অস্ত্রের খোঁজ করি।

এক সময় আমার নজরে পড়ে, নিগ্রোর পেছনে বেশ লম্বা ও চওড়া একজন শ্বেতাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটির দেহে যে অনেক শক্তি আছে, তা তার দেহের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়।

উচ্চতায় লোকটা সাত ফুটের কম নয়।

শ্বেতাঙ্গের মুখটা আমার বেশ চেনা চেনা লাগে। কিন্তু কোথায় যে তাকে দেখেছি, তা ঠিক করতে পারি না।

কেন না, ম্যালকম ওরনরা দুভাইই বামনের মত বেঁটে ছিল। দেখতে কদাকার ছিল।

এবার শ্বেতাঙ্গ লোকটা নিগ্রোটার হাত থেকে শটগানটা কেড়ে নেয়।

ভয়ে আধমরা নিগ্রোটার জামার কলার ধরে খেলনা পুতুলের মত ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে দেয়।

পরে, অপ্রস্তুতের মত হেলেনের দিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায়।

বলে, হতভাগা নিগ্রোটার ব্যবহারে ক্ষমা চাইছি। এবার দয়া করে গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিন মাননীয়া মহাশয়া।

ঠিক সে সময় বাড়ীর বাইরে প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়ে। চলতে থাকে মুসল ধারে বৃষ্টি।

মাটিতে পড়েথাকা নিগ্রোটার দিকে নজর পড়ে ম্যালকম ওরনের। সঙ্গে সঙ্গে সে নিগ্রোটার কলার চেপে ধরে। মাটি থেকে টেনে তোলে। তার দুগালে কষে চড় মারে। বলে, তোকে শেষ বারের মত সাবধান করে দিচ্ছি বাকোর্ড। আর কখনও যদি তুই শটগানে হাত দিয়েছিস, তবে তোকে খুন করে ফেলবো। আমি না থাকলে হয়ত তুই আমার সম্মানীত অতিথিদের মেরেই ফেলতিস।

নিগ্রো ওরফে বাকোর্ড ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

নিজের হাত দুটো জড় করে কি যেন বলতে চায়।

কিন্তু তার মুখ থেকে কোন শব্দ বের হয় না।

সে শুধু ভীত নেত্রে বাড়ীর খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিসের যেন আশঙ্কা করে।

শ্বেতাঙ্গ লোকটা বাকোর্ডের ছেঁড়া জামার কলার ছেড়ে দেয়।

শেষে বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে বলে, তাড়াতাড়ি মিলিকে ডেকে দে। মিলি তাদের নিয়ে যাবে। আর তুই রান্না ঘরে থাকবি।

শ্বেতাঙ্গের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাকোর্ড ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

মাতালের মত টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি ঘরটার চারদিকে তাকাই।

ঘরটার আসবাব পত্র কয়েক যুগ আগের। গৃহযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত দুটো বিরাট ও ভারী তরোয়াল দেয়ালে সযত্নে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

আমাদের কথা বলতে না দেখে শ্বেতাঙ্গ লোকটি নিজেকে ম্যালকম ওরণ বলে পরিচয় দেয়।

পরে বলে, আজকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া না হলে আপনাদের সঙ্গে দেখাই হত না মিসেস হেলেন। তবে আমি জোর দিয়ে

বলতে পারি যে, এই আবহাওয়াতে আপনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

তার পরেই শ্বেতাঙ্গ ওরফে ম্যালকম ওরন হেলেনের একটা হাত ধরে সসম্ভ্রমে মাথা নত করে।

পরেই ম্যালকম ওরনের চোখ জোড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বলে, আমার বাড়ীতে আজকে বেশ বড় রকমের দুর্যোগ ঘটে গেছে।

দুর্যোগের কথা শুনে আমি বিচলিত হই। প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে ম্যালকম ওরনের দিকে তাকাই। এবার আমার মনে পড়ে বামন ও কুৎসিত সহপাঠি ম্যালকম ওরন কি করে সাত ফুটের বেশী লম্বা হল। তাকে আর কুৎসিত বলা যায় না।

ম্যালকম ওরন আমার মনে উত্তাপ বুঝতে পারে।

পরে বলে, ব্যাপারটা হল আমার একটা ম্যাষ্টিক কুকুরকে কেউ হয়ত শেকল থেকে মুক্ত করেছে। কুকুরটা কোথায় যেন চলে গেছে।

আমাদের বাকোর্ড দরজার শব্দ শুনে ভেবেছিল, এই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে হিংস্র ও নিষ্ঠুর কুকুরটা বোধ হয় ফিরে এসেছে। সে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। তা না হলে চাকর হিসেবে সে খুবই ভাল।

আশাকরি, আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

ম্যালকম ওরন প্রথম থেকেই আমাকে তার অতীতের সহপাঠি হিসেবে চিনতে পেরেছিল।

হেলেন বিস্মিত নেত্রে ম্যালকম ওরণের দিকে তাকায়। তার মনে ঝড় বইতে থাকে।

এক সময় সে ম্যালকম ওরনকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা, আপনাকে অল্প অল্প চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় যে আপনাকে দেখেছি, তা মনে করতে পাচ্ছি না। আপনি কি এবিষয়ে আমাকে সাহায্য করবেন।

ম্যালকম ওরনের বিশাল মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

আস্তে আস্তে বলে, আগেই বলেছি, আমি হলাম ওরন। আপনার স্বামীর ছেলেবেলাকার বন্ধু। সহপাঠিও বলতে পারেন।

হেলেন চমকে ওঠে। আমতা আমতা করে বলে, না, মানে, সেই, আমি তো জানতাম আপনি একেবারে……

ম্যালকম ওরনের চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত চক্ চক্ করে ওঠে।

বলে, বেঁটে মানুষ বলে জানতেন তাই না ম্যাডাম? সে জন্যই প্রথম থেকেই আমার কণ্ঠস্বর ঘৃণা মিশ্রিত ছিল।

আমি কিছু বলার চেষ্টা করলে ম্যালকম ওরন আমাকে থামিয়ে দেয়।

বলে, আমি প্রথম থেকেই তোমাকে চিনতে পেরেছি টম। কিন্তু আমার দৈহিক পরিবর্তনের ব্যাপারটা অনেক বড় গল্প।

মানে…আমি কিছু বলতে গেলে ম্যালকম ওরন আবার আমাকে থামিয়ে দেয়।

বলে, সে সব কথা আমি আমাদের নৈশ ভোজনের সময় বলবো? তার আগে তোমরা আমাদের বিশ্রাম ঘরটা দেখে নেও তোমাদের গাড়ী থেকে তোমাদের ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্র আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তবে আমাদের নৈশ ভোজন আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরী হয়ে যাবে।

সে সময় একটি কালো মাঝবয়সী নিগ্রো মহিলা মোমবাতি নিয়ে হলঘরের পেছন দিক থেকে আসে। আমাদের দেখে মাথা নেড়ে অভিবাদন করে।

ম্যালকম ওরনের ইঙ্গিতে আমরা মহিলা ওরকে মিসিস পেছন পেছন হলঘর ছেড়ে বাড়ীর দোতলায় যাই। মিসিস নির্দেশিত ঘরে ঢুকি। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ করি।

। দুই ।

ঘরে ঢুকেই হেলেন ভয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়

বলে, ম্যালকম ওরন লোকটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারছি না। ওর চোখে মুখে কি রকম নিষ্ঠুর ভাব। ও কিছুতেই আমাদের অতীতের পরিচিত ম্যালকম ওরন নয়

আমি হেলেনকে সান্ত্বনা দিই

বলি, তোমার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না আবার ম্যালকম ওরনের বাঁ দিকের কানের নীচে যে জন্মগত দাগটা ও কপালে সরু লম্বা কাটা দাগটা তো অস্বীকার করতে পারিনা তবে প্রশ্ন হচ্ছে, বামন ও কুৎসিত ম্যালকম এখন কি করে এত লম্বা চওড়া হল, তা ঠিক বুঝতে পারছি না। এও বুঝতে পারছি না, আমরা যে ম্যালকম ওরণকে দেখছি, তাকি তার জীবন্ত চেহারা না, তার অতৃপ্ত আত্মার একরূপ ?

—ওর একটা দাদা ছিল না ? হেলেন ব্যস্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করে।

—তা ছিল। তবে শুনেছিলাম সে বিগত একবছর আগে ইহলোক ত্যাগ করেছে।

—বড় ভাই কি ওরই মত ছিল ?

—প্রায়। তবে উচ্চতায় পাঁচ ফুটের মত ছিল। নাম ছিল মারভিন ওরন। নিউইয়র্কে নাম করা ডাক্তার ছিল এক সময় গবেষণার দিকে তার মন যায়। নিউইয়র্ক ছেড়ে এই বাগান বাড়ীতে গবেষণাগার তৈরী করেছিল। গবেষণার বিষয় ছিল, মানুষের দেহের কোষগুলোকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে লম্বা করা।

আমি অল্প সময়ের জন্য চুপ করলে হেলেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

বলে, চুপ করলে কেন ?

আমি আবার বলতে শুরু করি, মৃত্যুর আগে মারভিন ওরন কয়েকটা সিরাম তৈরী করেছিল। বিভিন্ন পরীক্ষা করে এগুলো যে কার্য্যকরি হয়েছিল, তা প্রমাণ করে যায়। অবশ্য অল্প সময়ের পর ডিনারের সময় ম্যালকম ওরন সব কথা বলবে বলে জানিয়েছে। সে সময়টুকু আমাদের ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে হেলেন।

হেলেন আমার বক্তব্যকে সমর্থন জানায়।

কিন্তু তার মনে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, তা কমে না। বরঞ্চ বাড়তে থাকে।

সময় মত আমি হেলেনকে নিয়ে ডাইনিং রুমে যাই।

ডাইনিং রুমটা অতীতের মূল্যবান আসবাবপত্রে ভর্তি ছিল। সে সব দেখে মনে হয় যে, ম্যালকম ওরণদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল।

ডিনার টেবিল সুন্দর রূপোর বাসনপত্রে সাজানো ছিল।

সে সময় ডাইনিং রুমে কেউ ছিল না।

তাই আমি ডাইনিং রুমের সঙ্গে আর যে দুটো ঘর ছিল, সে দুটো ঘর দেখার জন্য যাই।

কিন্তু দুটো ঘরের দরজায় তালা লাগানো থাকায় আমি ঘরের ভেতরে যেতে পারি না

তবে ঘর দুটোর ভেতর থেকে স্যাঁৎসেঁতে প'চা গন্ধ নাকে আসে।

গা গুলিয়ে ওঠে। বমি পায়।

পরক্ষণে মনে পড়ে পুরোনো বাড়ীর ভেতরে সে সব সরীসৃপ ও পাখীরা আশ্রয় নেয়, সে সব সরীসৃপ ও পাখীদের মৃত দেহগুলি পচে এ জাতীয় গন্ধ বের হয়।

এক সময় আমার চোখে পড়ে কখন যে নিগ্রো চাকর বাকোর্ড ডাইনিং রুমের এক কোণে এসে দাঁড়িয়েছে।

তখনও তার দৃষ্টিতে ভয়ের ছাপ। তখনও সে জড়োসড়ো ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমাকে তাকাতে দেখে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মাথা নীচু করে আমাকে অভিবাদন করে। ডাইনিং টেবিলে বসতে ইশারা করে। মুহূর্তের মধ্যে ডাইনিং রুমের বাইরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়।

এক সময় ম্যালকম ওরণ তার স্ত্রী সিনথিয়াকে নিয়ে ডাইনিং রুমে আসে। সিনথিয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

লাল ভেলভেটের গাউনে সিনথিয়াকে সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু তার চোখে মুখে ছিল আতঙ্ক। শত চেষ্টা করেও সে মন খুলে হাসতে পারে না।

এক ঝলক হাসি তার সুন্দর ঠোঁট জোড়ায় মুহূর্তের জন্য খেলে যায়। অধিকাংশ সময় তাকে খুবই চিন্তিত মনে হয়।

ম্যালকম ওরনের ইঙ্গিতে শাকোর্ড সকলকে খাবার পরিবেশন করে।

খাবার খেতে খেতে ম্যালকম ওরণ আমাকে লক্ষ্য করে বলে, আমাকে আর বিবাহিত দেখে খুবই অবাক হচ্ছো, তাই না টম ?

সত্যি কথা বলতে, আমরাও আমাদের বিয়ে নিয়ে কম চিন্তিত ছিলাম না।

কথা বলতে বলতে ম্যালকম ওরণ সিনথিয়ার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকায়।

সিনথিয়া চোখ নিচু রেখে মৃদু হাসে। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। মুখে কোন কথা বলে না।

ম্যালকম ওরন সিনথিয়ার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে আস্তে আস্তে বলে, পরে অবশ্য অনেককিছুর পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য সে সব কথা সময় মত বলবো। ঠিক এই মুহূর্তে নয়।

কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিষ আমার দৃষ্টি এড়ায় না।

এতক্ষণ ধরে আমরা কত কিছুই না আলোচনা করেছি।

কিন্তু সিনথিয়ার সে দিকে কোন মন ছিল না। সে যেন

নেশা গ্রস্তের মত আপন মনে চুপ করে খেয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি।

অবশ্য আমাদের সব কটা প্রশ্নের উত্তর সিনথিয়া বলার আগেই ম্যালকম ওরন উত্তর দেয়।

। তিন ।

ডিনার খেতে খেতে এক সময় ডাইনিং রুমের বাইরে থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসে।

সে শব্দ শুনে বাকোর্ডের হাত থেকে অল্প একটু স্যুপ টেবিল ক্লথের ওপরে পড়ে।

ভয়ে বাকোর্ড কুঁচকে যায়।

ম্যালকম ওরণের ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায়। সে ডাইনিং টেবিল থেকে উঠতে যায়।

আমার মনে হয় ম্যালকম ওরন বোধ হয় আবার তার নিগ্রো চাকরটাকে মারধোর করবে।

তাই আমি ম্যালকম ওরনের দৃষ্টি বাকোর্ডের ওপর থেকে সরানোর জন্য বলে উঠি, আপনার শিকারী ম্যাষ্টিক কুকুরটা বোধ হয় কোন শিকার ধরেছে।

আমার কথাশুনে ম্যালকম ওরন ইশারা করে আমাকে চুপ করতে বলে। নিজে শব্দের দিকে কান পেতে থাকে।

ক্রমে বাইরের গোঁ গোঁ শব্দ আর্তনাদে পরিণত হয়। কোন পশু হয়ত বাঁচার জন্য গগনভেদী চিৎকার করছে।

ম্যালকম ওরণ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। কাউকে কিছু না বলে দ্রুত পায়ে ঘরে দরজার কাছে যায়।

আমিও বসে থাকতে পারি না। ম্যালকম ওরনের পেছু পেছু যাই।

ম্যালকম ওরণ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। তার মুখ খানা হিংস্র হয়ে ওঠে।

বলে, আমি না বলা পর্যন্ত ডাইনিং রুমের কেউ যেন ঘরের বাইরে না যায়।

ম্যালকম ওরনের হিংস্র ও কুটীল মুখ খানা দেখে যে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, তা সে বুঝতে পারে।

তাই সে মুহূর্তের জন্য নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করে।

মৃদু হেসে বলে, মনে কিছু কোরো না টম। আসলে ব্যাপারটি জান, আমি একলাই ব্যাপারটা সামলে নিতে পারবো। তোমার অন্ধকারের মধ্যে আসতে হবে না।

পরক্ষণেই ম্যালকম ওরন ঘরের বাইরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়। যাবার সময় ডাইনিংরুমের দরজা সশব্দে বন্ধ করে।

সে সময় রাধুনী মিলি রান্না ঘর থেকে ছুটে আসে। ভয়ে বাকোর্ডকে জড়িয়ে ধরে। মনের ভয়ভাবকে দূর করতে চেষ্টা করে। কোন কথা না বলে দুজনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। দুজনের দেহ ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে।

হেলেন সিনথিয়াকে লক্ষ্য করে বলে, এই অন্ধকার রাত্রে আপনার স্বামী নিশ্চয়ই ব্যাপারটা একলা সামলে নেবেন ?

সিনথিয়া কোন কথা বলে না। সে ডাইনিং টেবিলের ওপরে তাকিয়ে থাকে। তার সুন্দর ঠোঁট জোড়া মৃদু মৃদু কাঁপে কিছু বলতে চেষ্টা করেও বলতে পারে না।

পরে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে।

এই উৎকণ্ঠা ও চেপে রাখা ভয় তার স্বামীর জন্য নিশ্চয়ই নয়।

পরন্তু সে কোন অজ্ঞাত আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ছে।

একটু পরেই বাইরের কাতর আর্তনাদ স্তব্ধ হয়। চারিদিকে নির্জনতা নেমে আসে।

এক সময় ম্যালকম ওয়নের রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যেন কাউকে কঠোর স্বরে নির্দেশ দেয়।

এবারও সিনথিয়া কিছু বলার জন্য চেষ্টা করে। তার ঠোঁট জোড়া কেঁপে ওঠে। করুণ দৃষ্টিতে হেলেনের দিকে তাকায়। কি যেন বোঝাতে চায়।

তারপরেই সে নিজের ছোট রোমালটা ডাইনিং টেবিলের ওপরে বেছায়। লিপ্‌ষ্টিকের ষ্টিক দিয়ে রোমালের ওপরে কি যেন লেখে। কাঁপা কাঁপা হাতে রোমালটা হেলেনের দিকে এগিয়ে দেয়।

হেলেন রোমালটা নিয়ে নিজের পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে।

এ সময়ে বাইরের নিঃস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে একটা মৃদু খস্ খস্ শব্দ। কোন ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

হঠাৎ বাকোর্ড ভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

বলে, ঐ, ঐ সেই ভয়ঙ্কর খস্‌খস্ শব্দ। এটা কোন মতেই ম্যাষ্টিক কুকুরের ডাক নয়।

পরেই ম্যালকম ওয়ন ডাইনিংরুমে প্রবেশ করে

বলে, ম্যাষ্টিক কুকুরটা দিনে দিনে এত হিংস্র হয়ে উঠেছে যে, অচেনা লোকের কাছে সে একটা ভয়ের কারণ। বাইরে থেকে একটা ভবঘুরে কুকুর এসেছিল। ম্যাষ্টিক তাকে ধরে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলেছে।

ম্যালকম ওয়নের কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কেননা, দুটো কুকুর মারামারি করলে দুটো কুকুরের কণ্ঠস্বর শোনা যেত। একটা কুকুরের নয়।

কাজেই, ম্যাষ্টিক কোন মতেই কুকুর নয়। এত ভেতর নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।

হঠাৎ হেলেন বলে ওঠে, এ রকম হিংস্র কুকুরকে পুষে রাখা আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই ঠিক হয়নি মিঃ ওরন ?

ম্যালকম ওরনের বিশ্রী ঠোঁট জোড়ায় হিংস্র হাসি খেলে যায়।

সে বাকোর্ড ও মিলির দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

ওদের উদ্দেশ্যে বলে, তোমরা এখানে কেন ? এক্ষুনি এখান থেকে বিদেয় হও। আমাদের জন্য কফি নিয়ে এসো।

॥ চার ॥

একটু পরেই ম্যালকম ওরন নিজেকে সংযত করে নেয়।

মৃদু হেসে বলে, তোমাদের ড্রইংরুমে বসিয়ে কফি খাওয়াতে না পারার জন্য দুঃখিত টম্। তার কারণ হল, ঐ ঘরটায় আমি চিরদিনের জন্য তালা চাবি লাগিয়ে দিয়েছি। অবশ্য ও ঘরটায় আমার দাদা মারভিন ল্যাবরেটরী করেছিল।

ঘরটাও অদ্ভুত রকমের। ঘরটার ছাদ দোতলা সমান উঁচু। ঘরটা খুবই গরম। ওখানে বসলে এতক্ষণে ঝলসে যেতে।

কথাগুলো বলতে বলতে আবার ম্যালকম ওরনের চোখ জোড়া নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। ঠোঁটের ওপর খেলে যায় অজানা রহস্যের ইঙ্গিত।

চীনে মাটির পাত্রে কাল কফি পরিবেশন করে বাকোর্ড।

ম্যালকম ওরন কফির পাত্রে চামচে নাড়াচাড়া করতে করতে আবার বলে, আমার অতীত জীবনের রহস্যের কথা এবার তোমাদের বলবো টম। তবে ব্যাপারটা হল, আমি বৈজ্ঞানিক নই। কাজেই, সবটা হয়ত বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তবে আমার তরফে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

ব্যাপারটা হল, আমার দাদা মারভিন "ক্রমিক বৃদ্ধি" নিয়ে বেশ কয়েক বছর গবেষণা করে।

প্রথমে তার গবেষণার পরীক্ষা হয় কয়েক প্রকার জন্তু ও পোকা-মাকড়দের ওপর। তবে মানুষ হিসেবে সর্বপ্রথম আমার ওপরে পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষার গুণে আমি বামন আকৃতি থেকে লম্বা চওড়া মানুষে পরিণত হই।

একদিন আমার স্ত্রী সিনথিয়াও আমার বর্বাকৃতি চেহারার জন্য আমাকে ঘৃণা করত।

সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে আমার মন থেকে ভালবাসা চিরদিনের জন্য মুছে গেছে।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দানবাকৃতি ম্যালকম ওরনের চোখ জোড়া অঙ্গারের মত জ্বলে ওঠে।

ম্যালকম ওরনের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে হেলেন ভয় পায়।

সে দুহাতে আমার বাম বাহু চেপে ধরে।

অনুভব করি, হেলেনের দেহটা ভয়ে কাঁপছে।

ম্যালকম ওরন আবার বলতে শুরু করে।

আমার দাদা মারভিন বছর খানেক হল মারা গেছে। তার গবেষণার কাজকর্ম তার বন্ধু বিজ্ঞানীরা সাদরে গ্রহণ করে।

কিন্তু মুস্কিল হল, মারভিনের গবেষণাগারে তার গবেষণার কাগজপত্র ঠিকমত পাওয়া যায় না। যাও পাওয়া যায়, তা এলোমেলো।

অবশ্য দাদা মারভিনের গবেষণার ফল হিসেবে একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। বাকি পশুপাখীরা মারা গেছে।

ঠিক সে সময় একটা ছোট্ট কালো মাকড়সা কোথা থেকে ডাইনিং টেবিলের চাদরের ওপরে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যালকম ওরনের মুখ চোখ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

সে একটা খাবার কাঁটা নিয়ে কালো মাকড়সাটাকে গেঁথে

ফেলে। পরে ডাইনিং টেবিলের চাদরটার ওপরে আঙুল দিয়ে খেঁতলে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে সিনথিয়া জ্ঞান হারিয়ে চেয়ারের হাতলের ওপরে ঢলে পড়ে।

তাতে ম্যালকম ওরনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

এমনকি, সে সিনথিয়ার কাছে যায় না।

বাধ্য হয়ে আমিই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সিনথিয়ার কাছে যাই। রোমাল ভিজিয়ে তার মুখ চোখ পুছে দিই। তাকে বাতাস করি।

একটু পরেই সিনথিয়ার চোখের পাতা কেঁপে ওঠে। ঠোঁট জোড়া আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করে। একটু পরেই চোখ খোলে। বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে।

পরেই সিনথিয়ার চেতনা ফিরে আসে। সে সোজা হয়ে বসে। পরিস্থিতি বুঝে সঙ্কুচিত হয়।

এ সময়ে ম্যালকম ওরন কাপের বাকি চাটুকু গলায় ঢালে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কর্কশ স্বরে বলে, অনেক রাত হল। তোমাদেরও বিশ্রাম করার প্রয়োজন।

আমি ও হেলেন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াই। ম্যালকম ওরনের বক্তব্যকে সমর্থন জানাই।

সিনথিয়াও চেয়ারের হাতল ধরে অতি কষ্টে উঠেদাঁড়ায়। তখনও তার দেহটা এদিক ওদিক দুলছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সে ম্যালকম ওরনের হাত চেপে ধরে। ম্যালকম ওরন চলতে শুরু করে।

আমরাও ম্যালকম ওরনের পেছন পেছন এগোই।

ডাইনিং হলের সঙ্গে লাগানো বসবার ঘরের দরজায় তালা লাগানো ছিল। তবুও তার ভেতর থেকে দুর্গন্ধপূর্ণ বাতাস আমাদের নাকে আসে। সেসঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পাই।

আমরা ম্যালকমের সঙ্গে বাড়ীর দোতলায় আসি। দোতলা বারান্দার একপাশে সার সার ঘর।

আমাদের ঘরের কাছে এসে ম্যালকম ওরন দাঁড়ায়। শুভরাত্রি জানায়।

বলে, শুয়ে পড় টম। সারাদিন শরীরের ওপরে অনেক ধকল গেছে। রাত্রে যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তবে বেল টিপো। বাকোর্ড, কিংবা আমি আসবো। কোন মতেই ঘরের বাইরে বেরিও না।

যন্ত্রের মত সিনথিয়া আমাদের দিকে তাকায়। যান্ত্রিক হাসি হাসে। মাথা নোয়ায়। ম্যালকম ওরনের সঙ্গে নিজেদের ঘরে যায়।

ম্যালকম ওরনের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে হেলেন নিজের পোষাকের ভেতর থেকে সিনথিয়ার রোমালটা বের করে। ঘরের টেবিলের ওপরে ছড়িয়ে দেয়।

আমি রোমালটার ওপরে ঝুঁকে পড়ি।

দেখি, সিনথিয়া নিজের লিপষ্টিক দিয়ে রোমালের ওপরে লিখেছে, যদি বাঁচার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে থাকে, তবে এক্ষুনি এবাড়ী থেকে পালিয়ে যান।

আমি ও হেলেন আতঙ্কিত হয়ে উঠি। একে অন্যের দিকে তাকাই। অসহায় সিনথিয়ার করুণ মুখখানা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এই রাত্রে আমরা যে কি করব, তা ভেবে পাই না।

॥ পাঁচ ॥

এই আতঙ্কপূর্ণ রাত্রে আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে পারি না।

এ সময় সিনথিয়ার সঙ্গে আমাদের দেখা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

কেননা, প্রথম থেকে ম্যালকম ওরনের যে চেহারা আমরা দেখেছি, তাতে ওকে বিশ্বাস করা যায় না।

এ বিষয়ে একমাত্র সিনথিয়াই আমাদের বিপদ মুক্ত হতে সহায়তা করতে পারে।

ফলে সময় নষ্ট না করে খুবই সাবধানে ঘরের দরজা খুলি। পা টিপে টিপে সিনথিয়ার শোবার ঘরের দিকে যাই।

হঠাৎ নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে দোতলার সিঁড়ি আমি দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাই যে, নিচের হলঘরের এক প্রান্তে কে যেন ফিসফিস্ করে কথা বলছে।

একটু কানখাড়া করে শোনার পর মনে হয় ম্যালকম ওরন ফিসফিস করে কাকে যেন কি বলছে। তার কথার মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল।

আমি বেড়ালের মত নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাই।

এতক্ষণে ঝড় জল কমে গিয়েছিল। আকাশে বিরাট চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলো হলঘরের দরজার মাথার গ্লাস লাইটের ভেতর দিয়ে হলঘরে পড়েছিল।

অন্ধকার আমার চোখে সহ্য হয়ে গিয়েছিল।

তাই চাঁদের ম্লান আলোয় ম্যালকম ওরনকে চিনতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি।

তারপরেই হলঘরের সঙ্গে লাগানো বসবার ঘরটার তালা খোলা অবস্থায় দেখি। বসবার ঘর থেকে তখনও বিদঘুটে গন্ধ বের হচ্ছিল।

পরিবেশটা এমন রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছিল যে, ঐ বসবার ঘরে যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, তা অনুমান করতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি।

আরও একটু লক্ষ্য করে দেখি, ম্যালকম ওরন নিশ্চয়ই কোন মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে উত্তেজিত কণ্ঠে একলাই বলে যাচ্ছে। অন্যকারও কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না।

সে বলে যাচ্ছে, তোমার গলা পচা বিদঘুটে দেহটা একদিন নরকের অন্ধকারে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে। এক কালে তুমিই আমার শ্রদ্ধেয় দাদা ছিলে। আমার বামন ও বিদঘুটে চেহারার জন্য তুমি কতই না কষ্ট পেতে। সব সময় তোমার চিন্তা ছিল, কি করে এই অভিশাপ থেকে আমি মুক্তি পাব। পাব সুন্দর পুরুষের রূপ।

একদিন তুমি তোমার চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলে। আমার বিদঘুটে চেহারাটা লম্বা চওড়া সুপুরুষ করে তুলেছিলে কিন্তু আমার আচরণ বিধি যখন তোমাকে চিন্তিত করে তুললো, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

আমার ইচ্ছেই এখন তোমার ইচ্ছে। তুমি যেখানে আছ, সেখানেই থাক। অবশ্য আমার স্ত্রী সিনথিয়াও তোমার সঙ্গে বেশ শান্তিতেই থাকবে। কেননা, আমার বিদঘুটে চেহারার সময় সিনথিয়া আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিল, তা আজ পর্যন্ত আমি ভুলিনি। আজকের মত শুভরাত্রি জানাচ্ছি দাদা।

তারপরেই ম্যালকম ওরন রাত্রের নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শীষ দিয়ে ওঠে। হাতের আঙ্গুলগুলো মটকাতে থাকে। বোধ হয় তার প্রিয় কুকুরটাকে ডাকছে।

পরেই ম্যালকম ওরন ডাইনিং রুমের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটু পরেই বসবার ঘর থেকে একটা কালো ছায়া বেরিয়ে আসে। ম্যালকম ওরনের পেছন পেছন ডাইনিং রুমের দিকে যায়।

আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাই। ভাবি, বসবার ঘর থেকে বোধ হয় ম্যালকম ওরনের প্রিয় ও হিংস্র ম্যাজিক কুকুরটা বের হয়ে ডাইনিং রুমের দিকে গেল।

কিন্তু কুকুরের গতিবিধির সঙ্গে খসখস ও খুব জোরে হিস্ হিস্ শব্দ হবে কেন? তাছাড়া, এত দ্রুতবেগে গেল যে, ওটা কুকুর কিংবা অন্য কিছু বোঝার উপায় ছিল না! বাতাস দুর্গন্ধপূর্ণ হবেই বা কেন?

এ অবস্থায় কি করবো, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না।

একবার মনে হয়, সিনথিয়াকে ঘুম থেকে তুলে তার সাহায্য চাওয়া যাক।

আবার মনে হয়, সময় নষ্ট না করে রাতের অন্ধকারে হেলেনকে নিয়ে বাড়ী থেকে পালালেই সব বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

আমি পায়ে পায়ে সিন্থিয়ার ঘরের দরজার সামনে যাই। আঙুল দিয়ে দরজায় মৃদু আঘাত করি।

কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাই না।

ফলে, একবার বেশ জোরেই ঘরের দরজার পাল্লায় ধাক্কা দিই

এবার বুঝতে পারি, ঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা লাগানো।

সিনথিয়ার নাম ধরে দু একবার ডাকি। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

তখন ম্যালকম ওরনের কথা মনে পড়ে। সে প্রেতাত্মাকে বলছিল, "আমার স্ত্রী সিন্থিয়াও তোমার সঙ্গে বেশ শান্তিতেই থাকবে।"

কথাটা মনে পড়তে ভয়ে মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়।

এ সময় হিস্ হিস্ শব্দের সঙ্গে চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে কি যেন আমার পেছন দিয়ে আমাদের শোবার ঘরের দিকে গেল।

পরক্ষণেই হেলেনের গগন বিদারক আর্তনাদ শুনতে পাই।

। ছয় ।

হেলেনের আর্তনাদ শুনে দৌড়ে নিজেদের শোবার ঘরে যাই।

এক লাথিতে ভেজানো দরজা খুলে ফেলি। দরজার পাল্লার আঘাতে দরজার পাশের দেয়ালের চুণ পলেস্তারা খসে পড়ে।

ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখি ঘরের ভেতরকার সব জিনিষ ঠিক আছে। নেই শুধু হেলেন।

ঘরের জানালার কাছে গিয়ে লক্ষ্য করি জানালা দিয়ে হেলেনকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিনা ?

না, সেরকম কিছু চোখে পড়ে না।

তবে ফুট ফুটে চাঁদের আলোয় উঠোনের ওপর দিয়ে দুটো ছায়া মূর্তিকে অদৃশ্য হতে দেখি।

একটু ভাল করে দেখি, ছায়া মূর্তি দুটো হল বাকোর্ড ও মিলি কোন ভয়ঙ্কর আতঙ্কে তারা রাউন্ডপুরে ম্যালকম ওয়রেনের বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সময় নষ্ট না করে আমি আমার বড় টর্চ লাইটটা নিয়ে ঘর থেকে বেরোই। এ সময় আত্মরক্ষার জন্য একটা অস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন মনে করি।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ম্যালকম ওয়রেনের ডাইনিং রুমের দেয়ালে দুটো ভারি তরোয়াল দেওয়ালে সুন্দর করে টাঙানো আছে। তরোয়াল দুটো খুবই ভারী।

ঐ তরোয়ালের একটা যদি বাগে আনতে পারি, তাহলে হেলেনকে উদ্ধার করার সময় কাজে লাগতে পারে।

দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলাম।

কেননা, সে সময় ম্যালকম ওয়রেন সদ্য খোলা লাইব্রেরীর দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ চিৎকার করে কাকে যেন আদেশ দেয়, এক্ষুনি ছুটে যা। হতভাগাগুলোকে শিগ্গীর ধর।

তারপরেই হাতের আঙুলগুলো শশব্দে মট্ মট্ করে কোটায় আঙুল দিয়ে উঠোনের এক দিকের জঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করে।

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী হিস্ হিস্ হতে থাকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে কি ঝড়ের বেগে উঠোনের জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল

পরক্ষণেই ম্যালকম ওরনও উঠোনের একদিকের জঙ্গলের দিকে ছুটে যায় যাবার সময় উঠোনের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করতে ভোলে না

ম্যালকম ওরনের ভারি পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে আমি উঠোনে আসি। ম্যালকম ওরন তার বাহনকে নিয়ে যে বাকোর্ড ও মিলির পেছন নিয়েছে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

পরেই আমি ডাইনিং রুমে গিয়ে ঘরের দেয়ালে ঝোলানো বিরাট তরোয়ালের একটা পেড়ে নিই, তরোয়ালটা বেশ ভারী। ওর হাতলটা রুপোর কারুকার্য্য করা একটু চেষ্টা করার পর আমার পক্ষে তরোয়ালটা চালানো অসম্ভব হয় না।

তারপরেই এক ছুটে বসবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে আমি ঘরের ভেতরে ঢুকি।

ঘরের বিদ্ঘুটে গন্ধে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়

টর্চের আলোয় দেখতে পাই বিরাট উঁচু ঘরে বাতাসে বিরাজ করছে যেন মৃত্যুর বিষাক্ত ধোঁয়া

ভাল করে টর্চের আলো ফেলে দেখি, ঘরের এক কোনে সন্ধ্য ডিনার খাবার লাল ভেলভেটের পোষাক পরে সিনথিয়া শোয়া অবস্থায় শূন্যে ঝুলে আছে! ওর চুলের গুচ্ছ নিচের দিকে ছড়ান।

একটা রূপোলি দড়ি সিন্থিয়ার হাত, পা, দেহের প্রত্যেকটি অংশ শক্তভাবে জড়িয়ে আছে! তার চারপাশে রূপোলী রঙের মাকড়সার জাল ছড়ানো ছেটানো আছে

সিনথিয়া ছাড়াও বেশ কিছু জন্তু জানোয়ারের দেহ মাকড়সার

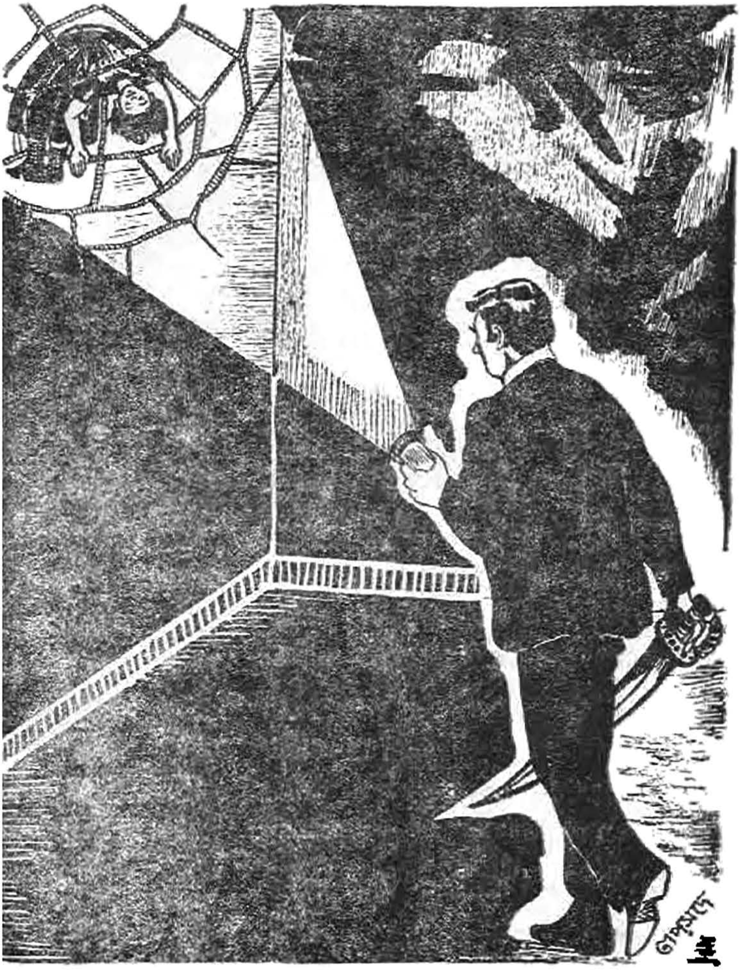

জালে আবদ্ধ হয়ে আছে। তাদের নড়াচড়ার উপায় নেই

আরও ভাল করে দেখি, ঘরের আর এক কোণে শক্ত মাকড়সার জালে জড়িয়ে আছে বৈজ্ঞানিক মারভিন ওরন।

বহুদিন ধরে এভাবে আছে বলে, মারভিন ওরনের দেহে কুষ্ঠন দেখা দিয়েছে।

আমি রাগের মাথায় মাকড়সার জালগুলোকে তলোয়াল দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করতে উদ্যত হই। কিন্তু ঘরের কোনে ঝুলন্ত মারভিন ওরন আমাকে এভাবে বিপদ ডেকে আনতে বারণ করে।

আরও বলে, যদি নিজের প্রাণের ওপর বিন্দুমাত্র মায়া থাকে, তবে এক্ষুনি এখান থেকে পালিয়ে যান। তা না হলে এই মাকড়সার জালের সামান্য অংশ আপনার দেহ স্পর্শ করলে, আপনি মাছির মত এই জালে জড়িয়ে পড়বেন। বাঁচার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

তবে আপনি যদি দক্ষ হাতে আপনার হাতের তলোয়ার চালাতে পারেন, তবে এ জাল কাটা তেমন কঠিন কাজ নয়।

তাই বলছিলাম, আপনার পেছনে একটা টেবিলের ওপরে গ্রীজ ভর্তি ক্যান আছে। পেছনে হুক লাগানো খুটি আছে। তার পাশে কয়েকটা চিমটে আছে।

আপনি ওগুলো আপনার হাতের তরোয়ালে গ্রীজ ভাল করে মাখান। নিজের দু হাতের চেটোতেও লাগান। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। তা না হলে, যে কোন সময় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

আমিও মারভিন ওরনের কথা মত কাজ করে গেলাম

তারপরেই গ্রীজ মাখানো খুঁটির হুক দিয়ে জাল টেনে তরোয়াল দিয়ে জাল কাটতে শুরু করি। চিমটে দিয়ে কাটা জালের অংশ-গুলো এক পাশে জড়ো করে রাখি।

তারপরেই ঝুলন্ত মারভিন ওরন বলে ওঠে, এবার ঝুলন্ত

মহিলাটির মাথার ওপর থেকে জালগুলো কেটে ফেলুন। মহিলাটিকে আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে আনুন।

কাজ শেষ হলে আবার মারভিন ওরন আমাকে সাবধান করে, একটা মোটা মাকড়সার জাল থেকে দূরে থাকতে। কেননা, ঐ জালটা আমাকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।

জালটাকে কাটতে দেখে মারভিন দুঃখ করে বলে, বেচারা সাদা-সিধে সিনথিয়ার ওপর কতই না অত্যাচার হয়েছে।

ওর দোষের মধ্যে হল, সে যৌবনে কুৎসিত বামন ম্যালকম ওরনের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে সময় সে বলেছিল, কোন সময় যদি ম্যালকম ওরন সুপুরুষ হতে পারে, তা হলেই সে ম্যালকম ওরনকে বিয়ে করবে।

তারপর থেকে ম্যালকম ওরন মহিলা জাতটাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করত। তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেলেই হাতছাড়া করে না।

বর্তমানে ম্যালকম ওরন তার বিভৎস সঙ্গীটিকে নিয়ে বিভিন্ন নোংরা কাজে মেতে আছে। অবশ্য, সেই জন্তুটার মুখের বিষ মেশানো লালা এখনও সিনথিয়ার দেহে প্রবেশ করায়নি। আজ রাত্রে ম্যালকম ওরন সেই হিংস্র পশুটাকে ছেড়ে রেখেছে।

তারপরেই মারভিন ওরন বলে ওঠে, বছর খানেক হল ম্যালকম ওরন এভাবে ঝুলিয়ে রেখে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে।

আমার পরীক্ষা যখন সাফল্য মণ্ডিত হয়, তখন সে আমার গবেষণাগারে এমন কিছু ওষুধ তৈরী করতে বলে যাতে সে যে কোন লোককে লম্বা থেকে বেঁটে করতে পারে।

তাছাড়া, ওর ইচ্ছে হিংস্র পিগমী শ্রেণীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা। ওদের ওপরে ম্যালকম যেভাবে খুশী অত্যাচার করতে পারবে। ওদের ওপর প্রভুত্ব খাটাতে পারবে।

কিন্তু আমি ওর পৈশাচিক মনবৃত্তিকে সমর্থন করতে পারিনি।

তাই সে আমার এ অবস্থা করেছে। প্রায়ই আমাকে সে আরও চরম শাস্তি দেবার ভয় দেখায়।

তারপরেই মারভিন ওরন সতর্ক হয়ে ওঠে।

বলে, তাড়াতাড়ি আবার তরোয়াল হুক ও চিমটেতে গ্রীজ লাগান। ওগুলো আঠার মত হয়ে গেছে। তারপর আমাকে নামাবার ব্যবস্থা করুন

মারভিন ওরনের কথা মত আমি তাকে মাকড়সার জাল থেকে মুক্ত করি। ঘরের মেঝেতে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলে দাঁড়াতে পারে না। কাত হয়ে পড়ে যায়।

অনেক কষ্টে এক সময় সে মাথা নীচু করে কাত হয়ে মেঝেতে বসে। অসাড় হাত দুটো দেহের দুপাশে নিস্তেজ হয়ে আছে। মুখ দিয়ে অব্যক্ত গোঙানী শব্দ বের হচ্ছে।

এদিকে এতক্ষনে মিনথিয়া ওরন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। আস্তে আস্তে মাটি থেকে ওঠার চেষ্টা করছে।

বিপদজনক জাল ছিন্নভিন্ন করেও নিজে বিপদ মুক্ত মনে হয় না।

কেননা, তখনও হেলেনকে আমি বিপদ মুক্ত করতে পারিনি।

আমার ধারণা, কেউ নিশ্চয়ই হেলেনকে বাড়ীর কোন গুপ্ত কুটুরিতে আটকে রেখেছে।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি হেলেনের উদ্দেশ্যে ঘরের দরজার দিকে ছুটে যাই।

দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই দেখতে পাই ম্যালকম ওরন ঘরের দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এক হাতে তার বাতিদান। অন্য হাতে ধরা কাঁধ থেকে ঝুলে থাকা হেলেনের জ্ঞানহীন দেহ।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ম্যালকম ওরনের মুখের ওপরে হাতের টর্চের আলো ফেলি।

টর্চের আলোয় ম্যালকম ওরপের হিংস্র চোখ জোরা বন্য প্রাণীর চোখের মত জ্বল জ্বল করে ওঠে।

বিকট স্বরে বলে, বাড়ীর শেষ মাছিটা দেখছি স্বেচ্ছায় মাকড়সার জালে ধরা দিতে এসেছে।

মিসেস হেলেন এক কালে বামন ও কুৎসিত বলে আমাকে অবজ্ঞা করত।

তাই, আজকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ওকে আমার প্রিয় দাদা ও স্ত্রী সিনথিয়ার সঙ্গে একই ঘরে থাকার জন্য ধরে নিয়ে এসেছি।

এছাড়া, অবাধ্য বাকোর্ড ও মিসিস নিষ্প্রাণ দেহ দুটো একটু পরেই এখানে এসে পৌঁছুবে। খুব তাড়াতাড়ি তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা দেহ দুটো মাকড়সার জালে আবদ্ধ হয়ে এখানেই থাকবে।

অবশ্য বন্ধু টম্, তোমার কথা আমি বিশেষ ভাবে চিন্তা করেছি

কেন না, ছেলে বেলায় আমার অদ্ভুৎ দেহটা দেখে তুমি খুবই দুঃখ পেতে। আমার চেহারার জন্য কেউ যাতে আমাকে আঘাত না করতে পারে, সে জন্য সব সময় তুমি আমাকে আগলে রাখতে।

তাই আমি ঠিক করেছি, সকলের শেষে তোমাকে মাকড়সার জালে জড়িয়ে দেব। তুমিও আমার দাদাদের মত শূন্যে ঝুলে থাকবে।

টর্চের আলোয় ম্যালকম ওরনের চোখ এমনভাবে ধাঁধিয়ে গিয়েছিল যে, ঘরের ভেতরে কত কি যে হয়ে গেছে, তা সে অনুমান করতে পারেনি।

একটু পরেই সে সব বুঝতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে অজ্ঞান হেলেনের শরীরটা মেঝের ওপরে ফেলে দেয়।

হাতের বাতিদানটা একটা টেবিলের ওপরে রাখে

আক্রোশে ফুঁসে ওঠে। বয়, বয় বলে চিৎকার করে ওঠে

ঠিক সে সময় কোন কিছু করার সুযোগ না দিয়ে আমি ম্যালকম ওরনের কপাল লক্ষ্য করে লোহার একটা চিমটে ছুড়ে মারি।

আমি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হই না। চিমটেটা ম্যালকম ওরনের কপালে খুব জোরে আঘাত করে।

আঘাতটা ঠিক সহ্য করতে পারে না ম্যালকম ওরন।

তার সমস্ত দেহটা কাঁপতে শুরু করে।

মাতালের মত টলতে থাকে।

তবুও ম্যালকম ওরন আমাকে ধরার জন্য সামনের দিকে এগোতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে সে কাটা গাছের মত সশব্দে ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়ে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজায় হাতের টর্চের আলো ফেলি। দরজা দিয়ে আর কোন বিপদ আসছে কিনা তা বুঝতে চেষ্টা করি।

টেবিল থেকে তলোয়ারটা তুলে নিয়ে প্রস্তুত হই।

না, সে রকম কিছু আমার চোখে পড়ে না।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে টর্চের আলো ঘরের অন্যদিকে ফেলার কথা চিন্তা করি।

ঠিক সে সময় দরজার ওপার থেকে হিস হিস্ শব্দ শুনতে পাই। তার সঙ্গে দুর্গন্ধ আসতে থাকে।

মনে হয় ঘরের বাইরে থেকে কোন প্রাণী দ্রুত ভাবে ঘরের দরজার দিকে আসছে।

॥ সাত ॥

একটু পরেই একটা কালো বিরাট মাকড়সা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

সন্ধ্যের সময় যে বিরাট কুকুরটাকে হত্যা করা হয়েছিল। মাকড়সাটা তার মত প্রকাণ্ড!

তার আটটা জলজ্বলে চোখ শয়তানের চোখের মত রক্তে ভরা ছিল। তার বিরাট লোমওয়ালা কালো পেট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মুখ থেকে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা দুটো গজ দাঁত বেরিয়ে ছিল।

মাকড়সাটা এক লাফে আমার সামনে আসে।

আমার রুদ্র মূর্তি দেখে মাকড়সাটা থমকে দাঁড়ায়।

চালাকি করে সে আমাকে এড়িয়ে হেলেনের দিকে যায়। মুখের বড় দাঁত দুটো হেলেনের নিষ্প্রাণ দেহে বসাবার জন্য সামনে দুটো পা তুলে প্রস্তুত হয়।

হেলেনকে বাঁচাবার জন্য হাতের তলোয়ারটা মাকড়সাটার দিকে ছুড়ে মারি।

তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে মাকড়সাটা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ায় মুহূর্তের মধ্যে ঘরের এক কোনে যায়। আমাকে আক্রমন করার জন্য প্রস্তুত হয়।

সে সময় আমার মনে হয়, কে যেন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে আমার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে নেয়। ভয়ঙ্কর মাকড়সাটার ওপরে টর্চের আলো ফেলে।

সিনথিয়ার এ জাতীয় সহায়তায় আমি উৎসাহিত হই। সিনথিয়াকে প্রশংসা না করে পারিনা।

সিনথিয়ার বুদ্ধি মত্তায় আমি সব সময় মাকড়সাটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তাকে সুবিধে মত আক্রমন করার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম।

সে সময় অর্ধমৃত মারভিন ওরন তার দেহটা হিঁচড়ে হিঁচড়ে অচেতন ম্যালকম ওরনের নিস্তেজ দেহটার কাছে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে।

হিংস্র কালো মাকড়সাটা সমানেই হিস্ হিস্ শব্দ করেই যাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করে আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

আমি মাকড়সাটাকে আমক্রন করার সুযোগ না দিয়ে তরোয়াল দিয়ে তার পেটে খোঁচা মারি

সঙ্গে সঙ্গে মাকড়সাটা তার আক্রমনের ধারা পাল্টে ফেলে।

সে বিদ্যুৎ বেগে ঘরের পুরোনো বিরাট পর্দা বেয়ে ঘরের অনেকটা ওপরে উঠে যায়।

পরক্ষনেই সে তীব্র বেগে আমার দিকে ছুটে আসে

আমিও সময় মত বেশ কিছুটা পিছিয়ে যাই।

মাকড়সাটা একলাফে আমার কয়েক ইঞ্চি সামনে এসে পড়ে।

এ সময় ম্যালকম ওরন জ্ঞান ফিরে পায়। মেঝে থেকে উঠে বসে মাথায় হাত দিয়ে আসল ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে।

ম্যালকম ওরন ব্যাপারটা বোঝার আগেই মারভিন ওরন তার দেহের ওপরে ঝাপিয়ে পড়ে

দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ম্যালকম ওরনের কণ্ঠনালী চেপে ধরে ঝাকুনি দিতে থাকে।

মারভিন ওরনের আক্রমনের ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালকম ওরন মারভিন ওরনের হাত থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।

ফলে, দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি শুরু হয়। দুজনে মেঝেতে গড়াগড়ি করতে থাকে।

এক সময়ে টেবিলটার ওপরে কাৎ হয়ে পড়ে টেবিলের ওপরকার বাতিদানটা সশব্দে ভেঙ্গে যায় বাতিদানের আগুন চারদিকে ছিট্‌কে যায়।

ঘরে জানালায় লাগানো ভারী পুরোনো পর্দায় আগুন লাগে।

ম্যালকম ওরন ও মারভিন ওরনের লড়াই দেখতে গিয়ে আমি এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম ফলে মাকড়সাটা একটা মোটা চট্‌চটে আঠা লাগানো মাকড়সার জাল আমার দিকে ছুড়ে দিয়েছিল। জালটা আমার তরোয়ালের ডগায় লাগে

আমার তরোয়ালটা আমার হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে

আমিও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মেঝে থেকে তরোয়ালটা তুলে নিই।

পরক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ম্যালকম ওরন নিজের দেহে হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছে।

মারভিন ওরনের হাত থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে

দুহাতে মারভিন ওরনের দেহটা মেঝেতে আছড়ে মারে

পরে দুর্বল ও অশক্ত মারভিন ওরনের ওপরে বসে ম্যালকম ওরন মারভিন ওরনের মাথায় দুহাতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে

সঙ্গে সঙ্গে ডিমের খোলা ভাঙ্গার মত মারভিন ওরনের মাথাটা ছাতু হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে

এদিকে ভারী পর্দার আগুনে ঘরের চারপাশ লাল হয়ে ওঠে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে মেঝের ওপরে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ি।

হাতের তলোয়ার দিয়ে মাকড়সাটার পেটে খোঁচা মারি।

তলোয়ারের ডগা মাকড়সাটার পেটের ভেতরে অনেকটা ঢুকে গিয়েছিল।

মাকড়সাটার পেট থেকে ঘন রক্ত ঝড়তে শুরু করে

আমি তলোয়ারটা টেনে নিয়ে আবার মাকড়সাটাকে আক্রমন করতে প্রস্তুত হই।

ঠিক সে সময় মাকড়সাটা এক লাফে ম্যালকম ওরনের ওপরে

ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার দাঁতের ভিতর দিয়ে বিষ ম্যালকম ওরনের দেহে ঢুকিয়ে দেয়।

ম্যালকম ওরন ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে ওঠে।

মাকড়সাটা এতদিনকার আক্রোশ মেটাতে পেরে বোধ হয় তার হিংস্র আটটা চোখ দিয়ে ম্যালকম ওরনের দিকে তাকায়।

এ সময় সিনথিয়া আমাকে একটানে পেছনে সরিয়ে নেয়।

ঠিক সে সময় জ্বলন্ত ভারী পর্দাটা খসতে খসতে ম্যালকম ওরন ও মাকড়সাটার ওপরে আছড়ে পড়ে।

আগুনের মধ্যে ম্যালকম ওরন ও ভয়ঙ্কর মাকড়সাটার দেহ আগুনে ঢেকে যায়।

আগুনের জিহ্বা হেলেনের অচেতন দেহটাকে স্পর্শ করার জন্য উদ্যত দেখে আমি হেলেনের কাছে ছুটে যাই। দু হাতে তার নিশ্চল দেহটাকে টেনে আগুনের আওতার বাইরে নিয়ে আসি।

পরে তাকে পাঁজা কোলে করে মেঝে থেকে তুলে নিই।

সে সময় হেলেনের জ্ঞান ফিরে আসে। সে চোখ খুলে তাকায়। ভয়ে দুহাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে।

আমি আর সময় নষ্ট করি না।

হেলেনকে পাঁজা কোলে করে দোজা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ি।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আমার গাড়ীতে হেলেনকে নিয়ে উঠে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে গাড়ী ছুটিয়ে দিই।

পেছনে ম্যালকম ওরনের বাড়ী আগুন সম্পূর্ণ গ্রাস করে।

। আট ।

নিজের বাড়ীতে আসার পর হেলেনের মন থেকে ম্যালকম ওয়েনের বাড়ীর আতঙ্ক দূর হয় না।

দিনে দিনে সে রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। তার মত হাসি খুশী মেয়ে যেন ঝিমিয়ে পড়ে।

আমি হেলেনকে সুস্থ করার কোন ত্রুটী করি না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

তবে হেলেনের কথা শুনলে মনে হয়, সেই ভয়ঙ্কর লোমশ কালো মাকড়সাটার অশরীরি আত্মা বোধ হয় হেলেনকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সে যেন প্রতিশোধ নিতে চায়।

এভাবে কয়েকদিন কেটে যায়।

একদিন গভীর রাতে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। প্রবল বেগে ঝড় ওঠে। পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়।

ঝড় জলের জন্য তেতলায় আমার ঘরে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। জানালার কাঁচগুলো বোধ হয় ঝড়ে অক্ষত রাখবে না। ঘন ঘন বাজ পড়তে শুরু হয়।

এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কোন এক অজানা আতঙ্কে হেলেন কাঁপতে শুরু করে।

আমি হেলেনকে সান্ত্বনা দিতে থাকি।

কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

এক সময় ভয়ে হেলেনের চোখ জোরা অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। রক্তহীন ঠোঁট জোড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

সে আমাকে আঁকড়ে ধরে।

ঘরের জানালার দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করে, দেখ, ওটা কি ?

আমি হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি।

বলি, ভাল করে চেয়ে দেখ হেলেন, কোথাও কিছু নেই। সবটাই তোমার মনের ভুল।

হেলেন শিশুর মত ভয়ে আমাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে।

অবোধ শিশুর মত বলে, তুমি একটু ভাল করে দেখ, সেই বিভৎস প্রাণীটা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে।

আমি আবার ভাল করে ঘরের জানালাটার দিকে তাকাই।

পরিবেশ আমার মনেও ভয়ের সঞ্চার করে।

তবুও আমি আমার মনের আতঙ্ক বাইরে প্রকাশ করতে দিই না।

বলি, শুধু শুধু তুমি ভয় পাচ্ছ হেলেন। ঘরে কোথাও কিছু নেই। ঘরের ভেতরে শুধু তুমি ও আমি আছি। তা ছাড়া আর কোন প্রাণী নেই

সঙ্গে সঙ্গে হেলেন প্রতিবাদ করে ওঠে।

বলে, না, না, তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। তুমি নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছে।

তার পরেই হেলেন পাগলের মত খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

বলে, ভাল করে দেখ, আমাদের ঘরের দেয়াল বেয়ে এগিয়ে আসছে আতঙ্কের বিভীষিকা।

আমিও নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারি না। আমারও চোখের সামনে ভেসে ওঠে ম্যালকম ওরনের বাড়ীর সেই ভয়ঙ্কর কালো লোমওলা মাকড়সাটার ছবি।

এ সময় চারিদিক কাঁপিয়ে কান ফাটানো শব্দ করে একটা বাজ পড়ে।

বজ্রপাতের আলো ক্ষণিকের জন্য আমাদের ঘরটা আলোকিত করে।

পরক্ষণে ঘরটা অন্ধকারে ডুবে যায়।

একটু পরে আমাদের বিছানার পায়ের কাছে অনুভব করি বলমান অশরীরির অস্তিত্ব।

সে আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে।

পরেই হেলেন প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে।

আমার মনে হয় এ জীবনে এটাই বোধ হয় হেলেনের শেষ চিৎকার।

তবুও আমার মুখ থেকে কোন শব্দ বের হয় না। আমি যন্ত্রের মত হেলেনকে চেপে ধরে থাকি। শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করি।

— —

কঙ্কালের একটা হাত

গী দ্য মোপাসাঁ

একজন ইংরেজ ভদ্রলোক মার্সেলিজ থেকে প্যারীতে আসে।

প্যারীর উপসাগরের শেষ প্রান্তে একটা ভিলা বার বছরের জন্য লিজ নেয়।

ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গী হিসেবে ছিল একজন ফরাসী চাকর। সে চাকরকে সে মার্সেলিজ থেকে আসার সময় নিয়ে আসে।

ভদ্রলোক অদ্ভুৎ ধরনের।

সে কারও সঙ্গে মেশে না। সহজে বাড়ী থেকে বের হয় না।

কেবল মাত্র শিকার ও মাছ ধরার জন্য সে বাড়ীর বাইরে যায়।

তবে প্রত্যেক দিন এক ঘণ্টা করে রিভালভার ও বন্দুকের প্রাকৃটিস করে।

এই অদ্ভুৎ চরিত্রের লোককে নিয়ে চারদিকে নানা রকম গুজব ছড়ায়।

কেউ বলে, ভদ্রলোক বেশ উঁচুদরের লোক। কোন রাজনৈতিক কারণে সে দেশ ছেড়ে এখানে এসে আত্মগোপন করেছে।

আবার কারও ধারণা, সে হল একজন ভয়ঙ্কর খুনী। লোকের চোখ এড়াবার জন্য এখানে আড্ডা গেড়েছে।......

এ রকম অদ্ভুৎ চরিত্রের লোক সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাটা অস্বাভাবিক নয়।

তাই খোঁজ খবর নিয়ে শুধু জানতে পারি ভদ্রলোকের নাম হল স্যার জন রাওয়েল।

ওর ওপরে কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করলাম।

কিন্তু তাতেও স্যার জন রাওয়েল সম্বন্ধে সন্দেহ'জনক কিছু পাওয়া যায় না।

শেষে স্থির করলাম স্যার জন রাওয়েলের সঙ্গে আলাপ করব।

কিন্তু কিভাবে আলাপ করব তা ভেবে উঠতে পারি না।

তাই একদিন স্যার জন রাওয়েলের সীমানার মধ্যে একটা পাখী শিকার করি। পাখীটাকে যেহেতু স্যার জন রাওয়েলের সীমানার মধ্যে পড়েছে, সে কারণে পাখীটা তাকে নিতে 'অনুরোধ জানাই। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

স্যার জন রাওয়েল দেখতে অনেকটা হারকিউলিসের মত।

তার চুল লাল। এক মুখ দাড়ি। অস্বাভাবিক লম্বা ও চওড়া। ব্যবহার খুবই মার্জিত। ফরাসী উচ্চারনে যথেষ্ট ইংরেজির টান আছে।

আমার ভদ্রতার জন্য ভদ্রলোক প্রশংসা করে। আমাকে যত্ন করে বসায়। অনেক বিষয়ে আলোচনা করে।

ভদ্রলোকের কথা শুনে সন্দেহ জনক কিছু মনে হয় না।

ফলে, এক মাসের মধ্যে পাঁচবার স্যার জন রাওয়েল এর বাড়ীতে যাই।

একদিন স্যার জন রাওয়েল এর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাই। স্যার জন রাওয়েলকে অভিবাদন করি।

স্যার জন রাওয়েল আমাকে একমাত্র বিয়ার খাবার আমন্ত্রন জানায়।

আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

বিয়ার খেতে খেতে জানতে পারি ফ্রান্স ও কর্ণিক ওর খুবই পছন্দ। এ অঞ্চলের সমুদ্র উপকূল তার কাছে অজানা কিছু নেই।

তারপর স্যার জন রাওয়েল জানান যে, সে আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, আমেরিকা ইত্যাদি অনেক দেশ ঘুরেছে। অনেক রোমাঞ্চকর

ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। বাঘ, হাতি, জলহস্তি ইত্যাদি অনেক শিকার করেছে।

স্যার জন রাওয়েলের কথা শুনে আমি অবাক হই।

বলি, এসব শিকার করতে যে বড্ড জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়?

স্যার জন রাওয়েল প্রাণ খোলা হাসি হাসে।

বলে, ওদের চেয়ে মানুষ তো বেশী বিপদজনক। তবে আমি মানুষও শিকার করেছি।

আমি আবার অবাক হই।

বলি, মানুষ শিকার মানে?

স্যার জন রাওয়েল সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানায়।

তারপর আমাকে নিয়ে তার বসার ঘরে যায়।

বসবার ঘরে গিয়ে দেখি, বসবার ঘরের দেয়ালে নানান রকম বন্দুক সাজানো আছে। নানান রকম বাহারের জিনিষ পত্র দিয়ে বসবার ঘর সাজানো।

বসবার ঘরের মাঝখানে বড় প্যানেলের ঠিক মাঝখানে ভেল-ভেটের সুদৃশ্য কাপড়ের ওপরে একটা শুকনো মানুষের হাত সযত্নে রাখা ছিল।

হাতটা থেকে মাংস সরিয়ে ফেলা হয়নি। মাংস, চামড়া ইত্যাদি হাতটার সঙ্গে শুকিয়ে ফেলা হয়েছে।

এখনও হাতের আঙ্গুলে বড় বড় হলদে নোখ আছে।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি, কোন লোকের কুনুই থেকে তার একটা হাত কুড়ুল জাতীয় ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তার দেহ থেকে আলাদা করা হয়েছে।

হাতটার কব্জিতে মোটা লোহার চেন শক্ত করে আঁটা। সেই চেনটা দেয়ালের সঙ্গে মজবুত রিং এর সঙ্গে আটকানো। রিংটা এত শক্ত যে, হাতি বেঁধে রাখা যেতে পারে।

সব মিলিয়ে বসবার ঘরটা কি রকম যেন ভয়াবহ মনে হয়

আমি কাটা হাতটাকে ইঙ্গিত করে বলি, এটা আবার কি ?

স্যার জন বাওয়েল একটু কঠিন হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে বলে, ওটা হল আমার জীবনের সব চেয়ে শত্রুর হাত। লোকটা আমেরিকার অধিবাসী।

কোন কারণে প্রায় প্রতিশোধ নেবার জন্য তরোয়াল দিয়ে তার হাতের কনুই থেকে হাতটা কেটে নেওয়া হয়। তারপর হাতটাকে রৌদ্রে শুকুই। ফলে, হাতটা যেমন ছিল, সে রকম থেকে যায়।

আমি ভয়ে ভয়ে হাতটাকে স্পর্শ করি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয়, এ হাতটা যার, তার দৈহিক শক্তি কম নয়।

হাতের আঙুলগুলো বেশ বড় বড়। গাঁটগুলো মোটা মোটা।

হাতটা দেখে আমার কেন জানিনা মনে হয়, হাতটা প্রতিহিংসা নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

তবুও আমি স্যার জন বাওয়েলকে প্রশ্ন করি, যার হাত, তার নিশ্চয়ই গায়ে খুব জোর ছিল ?

হ্যাঁ, তা ছিল। সে জন্যই তো হাতটাকে লোহার শেকলে আটকে রেখেছি। স্যার জন বাওয়েল নির্বিকার স্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করে।

এবার আমি হেসে ফেলি।

বলি, আপনার কি কখনও মনে হয় স্যার জন বাওয়েল যে, হাতটা জীবন্ত হয়ে আবার আগের মত নড়াচড়া করতে পারবে ?

স্যার জন বাওয়েলের মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে বলে, সে রকম সম্ভাবনা আছে বলেই চেন দিয়ে বেঁধে রাখা।

আমার হাসি পায়।

মনে হয়, স্যার জন বাওয়েলের একলা থাকতে থাকতে ওর

মাথাটা হয়ত কিছু গণ্ডোগোল হয়েছে। তা না হলে এই অবাস্তব কথা বলতে পারে ?

তারপরেও আরও কয়েকবার গেলাম স্যার জন রাওয়েলের বাড়ীতে।

কিন্তু সে রকম কোন অস্বাভাবিকভাব দেখতে পেলাম না।

তারপর অনেকদিন আর স্যার জন রাওয়েলের বাড়ীতে যাওয়া হয়ে ওঠে না।

অবশ্য তার সম্বন্ধে গুজব ওঠা অনেক কমে এসেছে।

প্রায় এক বছর পরে নভেম্বর মাসে একদিন সকালে চাকরের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায়

সে বলে, গতকাল রাত্রে স্যার জন রাওয়েল খুন হয়েছেন।

আধঘণ্টা পরে পুলিশের সঙ্গে স্যার জন রাওয়েলের বাড়ীতে যাই।

বাড়ীর দরজায় স্যার জন রাওয়েলের ফরাসী চাকরকে কাঁদতে দেখি।

প্রথমে কিন্তু আমার স্যার জন রাওয়েলের চাকরকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করি।

কিন্তু পরে খোঁজখবর নিয়ে জানি যে স্যার জন রাওয়েলের চাকরের এই খুনীর ব্যাপারে কোন যোগ সাজস ছিল না

তবে খুনীকে, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে চিন্তা দেখা যায়।

স্যার জন রাওয়েলের বসবার ঘরের মাঝখানে তার মৃত দেহটাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

সে সময় স্যার জন রাওয়েলের ওয়েষ্ট কোট ছেঁড়া ছিল। কোটের একটা হাত ছিঁড়ে গিয়েছিল।

সব দেখে মনে হয়। হত্যাকারীর সঙ্গে স্যার জন রাওয়েলের বেশ মারামারি হয়।

স্যার জন রাওয়েলের চোখে মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিল। কিছুর আঘাতে তার মুখখানা ফুলে গিয়েছিল।

কাঁধে পাঁচটা ক্ষতের চিহ্ন ছিল। তা থেকে অনেক রক্ত বের হয়েছে।

আর দাঁতে দাঁত শক্ত করে বন্ধ ছিল।

পোষ্টমর্টেমে প্রকাশ পায় যে, স্যার জন রাওয়েলের গলায় আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়।

কোন কঙ্কালের হাত তার কণ্ঠনালী চেপে ধরে তার শ্বাসরুদ্ধ করেছে।

দেয়ালে বড় প্যানেলের কাছে গিয়ে দেখি আগের সেই কাটা হাতটা আর ভেলভেটের কাপড়ের ওপরে নেই। হাতের সঙ্গে বাঁধা সেই লোহার চেনটা ভাঙ্গা।

আমি কি রকম যেন আতঙ্ক অনুভব করি।

স্যার জন রাওয়েলের মৃত দেহটা আর একবার দেখি।

এবার দেখতে পাই, মৃত স্যার জন রাওয়েলের দু'দাঁতের ফাঁকে সাজিয়ে রাখা সেই হাতের একটা আঙুলের অংশ ধরা আছে।

এ ছাড়া স্যার জন রাওয়েলের বাড়ীতে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পাই না।

এমন কি, স্যার জন রাওয়েলের বাড়ী থেকে মূল্যবান কিছু চুরি যায়নি। তার দু-দুটো শিকারীর কুকুরও কিছুর ইঙ্গিত পায়নি।

তারা সমস্ত রাত শান্তিতে ঘুমিয়েছে।

স্যার জন রাওয়েলের চাকরকে প্রশ্ন করে জানতে পারি, বিগত কিছু দিন ধরে স্যার জন রাওয়েল মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিল।

এ সময় প্রায় রোজই গোছা গোছা চিঠি তাকে আসতো।

স্যার জন রাওয়েল চিঠিগুলো সব আগুনে পুড়িয়ে দিত।

খুনের মাত্র কয়েক দিন আগে স্যার জন রাওয়েল এক এক সময় পাগলের মত ছট্‌ফট্‌ করত।

চাবুক দিয়ে সাজিয়ে রাখা কাটা হাতটাকে মারত। বিড় বিড় করে কি যেন বলতো।

সে সময় স্যার জন রাওয়েল বেশ দেরী করে শুতে যেত। সব সময় নিজের কাছে রিভালভার রাখতো। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করত।

অনেক দিন রাত্রে স্যার জন রাওয়েল চিৎকার করে কারো সঙ্গে ঝগড়া করত।

সে সময় ঘরে কিন্তু স্যার জন রাওয়েল ছাড়া আর কেউ ঘরে থাকতো না।

যে দিন ঘটনা ঘটে, সে দিন রাত্রে স্যার জন রাওয়েলের ঘর থেকে কোন অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যায় না।

তবে স্যার জন রাওয়েলের ঘরের জানালা খোলা ছিল।

ফলে সকাল বেলা ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় স্যার জন রাওয়েলের ফরাসী চাকর স্যার জন রাওয়েলের মৃত দেহ ঘরের ভেতর পড়ে থাকতে দেখা যায়!

এ রকম বিভৎস দৃশ্যের কথা স্যার জন রাওয়েলের চাকর কল্পনা করতে পারেনি।

এ ঘটনা ঘটার পর সমস্ত দ্বীপে হৈ হৈ পড়ে যায়। তিলকে তাল করে খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ বিভাগও যথাসাধ্য খুনের তদন্ত করে। কিন্তু খুনীকে খুঁজে পায় না।

তবে একদিন স্যার জন রাওয়েলের চাদরের ওপরে সেই হারিয়ে যাওয়া হাতটা পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এবার কিন্তু হাতটার একটা আঙ্গুল কাটা দেখা যায়।

ভূতের ঔষুধ

পু, সুং, লিং

পেং চেং শহরে ল্যাং নামে একটা যুবক বাস করত।

সে ছেলে বেলা থেকে বইয়ের পোকা ছিল।

বই পেলে সে সব কথা ভুলে থাকতে পারতো।

ফলে, বই ছাড়া সে আর তেমন কিছু জানে না।

ল্যাং এর বাবা মারা যাবার পর ল্যাং এর জন্য রেখে যায় একটা পুরোনো আমলের ঝড়ঝড়ে বাড়ী।

সেই বাড়ীর অধিকাংশ ঘর বইয়ে ঠাসা।

ল্যাং এর বাবাও সারা জীবন অতীতের লেখক ও কবিদের পুরোনো পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করত। সে সব পাণ্ডুলিপি থেকে বিভিন্ন লেখা পাঠোদ্ধার করে সকলের কাছে প্রশংসা পেতে চেষ্টা করত।

ল্যাংও বাবার অভ্যেস পায়। ফলে, কি করে টাকা পয়সা রোজগার করে নিজের পেট চালাবে, তা সে জানতো না।

ফলে, মাঝে মাঝে মৃত মার গয়নাগাটি, কিংবা বাবার পুরোনো কোট বিক্রি করে সে পেট চালাতো।

তবুও সে মান্ধাতা আমলের কোন বই-ই বিক্রি করার কথা চিন্তা করত না।

অবশ্য অনেক সময় বাবার মত পুরোনো লেখকদের পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু লেখা ছাপিয়ে পয়সা রোজগার করতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু আধুনিক যুগে সে সব বস্তাপচা লেখার কেউই কদর করেনি।

ফলে, ল্যাং বিফল মনরথে আবার বইয়ের স্তূপে আশ্রয় নেয়।

ল্যাং নিজের পোষাক আষাকের দিকে বিন্দু মাত্র লক্ষ্য করত না। ফলে, তার জামাকাপড় ভীষণ নোংরা থাকে। গা থেকেও দুর্গন্ধ বের হয়। সহজে কেউ তার কাছে আসতে চাইতো না।

একদিন ল্যাং মনের দুঃখে পুরোনো বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে একটা বই হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে যায়।

পাতলা বইটা দমকা হাওয়ায় ঘরের দরজা থেকে বেরিয়ে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে পড়ে যায়। বইয়ের ভেতর থেকে কয়েকটা ভুট্টার দানা মাটিতে পড়ে।

সেই ভুট্টার দানা গুলো কুড়িয়ে নিয়ে ল্যাং মনে মনে তার মৃত বাবার কথা ভাবে।

তার বাবা সব সময় বলতো, বই পত্র পড়ে যারা বিদ্বান হয় তারাই বড়লোক হয়।

আজকে বইয়ের ভেতর থেকে ভুট্টার দানা পেয়েছে। একদিন হয়ত মণি মাণিক্য পাবে। সেও বড়লোক হবে।

এর কিছুদিন পরে সে বই পত্র পরিষ্কার করতে করতে বইয়ের স্তূপের মধ্যে থেকে একটা খেলনার গাড়ী পায়। খেলনার গাড়ী পরিষ্কার করলে গাড়ীটার রং সোনালী হয়। খেলনাটা সোনার মনে হয়।

কিন্তু ল্যাং-এর বন্ধুরা ওকে বোঝায় যে, আসলে খেলার গাড়ীটা সোনা নয় ওটা পেতলের।

তারপরেই একদিন এক বন্ধুর বাবা তার বাড়ীতে আসে। তার পিতলের খেলনাটা দেখতে চায়।

বন্ধুর বাবা অতীতের শিল্পকাজের নমুনা সংগ্রহ করত।

তাই ল্যাং এর খেলনা গাড়ীটা দেখে তার খুব পছন্দ হয়। সে তিনশো রূপোর অর্থ দিয়ে সেই খেলনাটা ল্যাং-এর কাছ থেকে কিনে নেয়।

অর্থ পেয়ে ল্যাং এর খুবই আনন্দ হয়।

সে ভাবে, বই পরিষ্কার করতে করতে সে মামুলি খেলনাটা পেল, সেই খেলনাটা তাকে এতঅর্থ এনে দিল! এরপর হয়ত এই বইয়ের স্তূপ তাকে আরও অর্থ, বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি নিশ্চয়ই এনে দেবে।

তারপর থেকে ল্যাং গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে পড়াশুনা শুরু করে

একবার ল্যাং সরকারী চাকরী দেবার জন্য পরীক্ষায় বসলো।

ল্যাং টুকলি করা তো দূরের কথা, টুকলির কথা কোন দিন শোনেওনি।

কাজেই, সে কোন্ বিষয়ে তেমন কোন সুবিধে করতে পারে না।

কিন্তু অন্যান্য পরীক্ষার্থী গার্ডকে ঘুষ দিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টুকলি করে যায়।

পরীক্ষার ফল বের হলে, ল্যাং বিরাট একটা শূন্য পায়।

যারা টুকলি করছে, তারা সকলেই সরকারী অফিসের বড় বড় অফিসার হয়।

স্বভাবতই ল্যাং-এর দুঃখ হয় পড়ার ঘরে বই পত্র ঘাটতে থাকে।

এক সময়ে একটা ভৌতিক বইয়ে তার মন আকৃষ্ট করে। এক নিঃশ্বাসে বইটা পড়ে ফেলে

বই পড়ার পর তার মনে খুবই ভয়ের সঞ্চার হয়।

মাঝরাতে সে পরিষ্কার দেখতে পায় কচি কচি ভূত শকুনের বাচ্চার স্বর নকল করে কাঁদছে। নাকী সুরে সুরে গান গাইতে শুরু করে বোঁচা ভূত। গাছের ডালে পা আঁটকে মাথা নীচু করে বিরাট বিরাট দাঁত বের করে ঝুলে আছে দেঁতো ভূত। সুড় সুড়ি ভূত ঘরের জানালা গলে ছোট ছেলে মেয়েদের সুড় সুড়ি দেবার জন্য রোগা কালো হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ল্যাং খুব সরল মনের যুবক। তার ধারনা বইয়ে যা আছে, তার সবটাই সত্যি।

এদিকে ল্যাং-এর পুরোনো মান্ধাতা আমলের বাড়ীর ঘরে ঘরে দেয়াল থেকে পলেস্তরা খসে পড়েছে। যায়গায় যায়গায় মাকড়সার জাল। ছাদের কাঠের বর্গা জীর্ণ হয়ে এসেছে। যে কোন দিন ঘাড়ে পড়লো বলে।

ভূতের বইয়ের একটা ছবি ল্যাংকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছে।

ছবিটি হল একটি সুন্দরী মেয়ের। একবার তাকালো সেই ছবি থেকে চোখে ফেরানো খুবই কষ্টকর।

ল্যাংও ছবিটা দেখে তন্ময় হয়। সে ছবিটা থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

এক সময় ল্যাং এর মনে হয় ছবিটা আস্তে আস্তে কাঁপছে।

সে সময় এক ঝাঁক কুয়াশা ঘরের ভেতরে ঢোকে। বাতাস ভরে ওঠে সুন্দর চন্দনের গন্ধে। টেবিলের ওপরে মোমবাতিটা দপ্ দপ্ করতে শুরু করে।

এক সময় ল্যাং অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, ছবিতে সুন্দরী মেয়েটা নেই!

ল্যাং চশমাটা ঠিক করে আবার হাতে ধরা বইটার ছবি দেখে।

এবার কিন্তু ছবির ভেতরে সেই সুন্দরী মেয়েটাকে দেখতে পায় না।

পরক্ষণে সে একটি সুরেলা যুবতীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ঘরের ভেতর থেকে।

ল্যাং চমকে ওঠে তার নাকের ডগা থেকে চশমাটা পড়ে যাবার উপক্রম হয়।

সে শশব্যস্ত হয়ে চশমাটা নাকের সঠিক জায়গা মত রাখে।

ভাল করে ঘরের ভেতরে চোখ বোলায়।

দেখে, ঘরের আধো অন্ধকারে একটি প্রকৃত সুন্দরী যুবতী মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

তার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি !

তারপরেই যুবতীটি পায়ে পায়ে লাং এর কাছে আসে ।

সেতারের শব্দের মত মিষ্টি শব্দে সে হাসে। মিষ্টি করে বলে আমার নাম জুজু। আমি সকলকে ভালবাসি বলে অনেকে আমার ভালবাসার ভূত বলে থাকে।

এরপর ল্যাং নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারে না।

সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করে।

বলে, আমি কি সত্যিই স্বপ্ন দেখছি?

জুজু ওরফে যুবতীটি তার রং করা সুন্দর হাতটা ল্যাং এর নাকের কাছে আনে। আলতো করে চিমটি কাটে।

ল্যাং কঁকিয়ে ওঠে।

বলে, বড্ড লেগেছে। ভূতরা কি চিমটিও কাটতে পারে।

জুজু আবার মিষ্টি করে হাসে।

বলে, তা হলে বুঝতে পাচ্ছ যে তুমি স্বপ্ন দেখছো না। যা দেখছো, তা একশো ভাগ সত্যি।

ল্যাং কাঁপতে কাঁপতে বলে, আমার ওপরে এত দয়া কেন জুজু? অন্যের কাছে তো যেতে পার?

জুজু দুষ্টুমি হাসি হাসে।

বলে, না গো না। তোমার কাছে না এসে থাকতে পারি না। কেননা, আমাদের রাজা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে।

—কেন বাবা?

—কারণ আজীবন বইয়ে মুখ গুঁজে থেকে তুমি জাহান্নামে গেছো। এ জগতের কিছুই জানো না তুমি।

তাই তোমার মাথা থেকে বই পোকাগুলো তাড়িয়ে তোমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করা আমার বর্তমান কর্তব্য।

—তুমি এভাবে কতদিন আমাকে ভয় দেখাবে? ল্যাং হাত জোড় করে জুজুকে প্রশ্ন করে।

জুজু হাসতে হাসতে বলে, আমি যার ঘাড়ে চাপি, তার ঘাড়

সহজে যাই না। একদম বেকায়দায় না পড়লে তোমার ঘাড় থেকে নামবো না।

ল্যাংকে ইতঃস্তত করতে দেখে জুজু ল্যাং এর হাত ধরে তাকে পড়ার টেবিল থেকে ওঠায়।

বলে, আজকের রাত্রির মত ঘুমিয়ে নাও। কালকে সকালেই আমি তোমার কাছে পুরোনো হয়ে যাব।

আমাকে আর তোমাকে ভয় পেতে হবে না।

নিরুপায় হয়ে ল্যাং জুজুর নির্দেশ মেনে নেয়।

শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়।

পরের দিন সকাল বেলা জুজু ল্যাং এর ঘুম ভাঙ্গায়।

ল্যাং মুখ ধোবার পর ওকে নিয়ে জুজু খাবার টেবিলে বসে।

বলে, এবার তোমার সব বই বিক্রি করতে হবে।

জুজুর কথা শুনে ল্যাং নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না।

জুজুর দিকে প্রশ্ন বোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকায়।

জুজু দুষ্টুমি হাসি হেসে বলে, ঠিকই বলেছি। তোমার বাড়ীর সব বই-ই বিক্রি করতে হবে। তা না হলে তুমি অকম্মার ধাড়ী হয়ে থাকবে।

—তুমি কি বলছো জুজু? সুং-চেং-সুং এর উপদেশবলী, মহাবোধি জাতক, কনফুসিয়াসের কথা, লাওসের তিনটি মূল্যবান উপদেশ ইত্যাদির কোন মূল্য নেই এখন?

জুজু ল্যাংয়ের কথার কোন গুরুত্ব দেয় না।

বইয়ের গাদার কাছে ও দাঁড়ায়। ডান হাতে তুড়ি বাজায়।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বইয়ের পাতা ফাঁক হয়।

তার ভেতর থেকে মৃত সম্রাট সুং-চেং-সুং সোনালী রাজকীয় পোষাকে বেরিয়ে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে জুজু মাথা নীচু করে সম্রাট সুং-চেং-সুংকে অভিবাদন করে।

পরে মিষ্টি করে হেসে বলে, আমরা একটা সমস্যা নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আশাকরি আপনি আমাদের সে সমস্যা দূর করতে সহায়তা করবেন।

সম্রাট সুং-চেং-সুং মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

বলে, বেশ, তোমাদের সমস্যার কথা বল।

জুজু বলে, আমাদের একটা মাত্র প্রশ্ন, আধুনিক যুগে অতীতের বস্তা পচা গ্রন্থাবলী পড়া কি ভাল, না খারাপ ?

সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট সুং-চেং-সুং এর মুখ খানা কুইনাইন খাওয়ার মত বিকৃত হয়।

মুখ থেকে এক কেনা থুথু মেঝেতে ফেলে।

ল্যাং সময় মত সাবধান মত দূরে না গেলে থুতুর ঢেলা তার গায়ে পড়ত।

পরে সম্রাট সুং-চেং-সুং বিকৃত মুখে বলে, অতীতের ধারনাকে যারা আঁকড়ে ধরে আছে তাদের গর্দভ ছাড়া আরকিছু বলা যায় না।

পুরনো ধারনার বশীভূত হয় সাধারণত মাতাল, পাগল ও গর্দভেরা।

এই পুরোনো ধারনা আমাকে পথের ভিখারী করে তুলেছে।

আমি হারিয়েছি আমার রাজ্য। জনসাধারনের কাছে পরিচিত হয়েছি পাগলা রাজা বলে।

এমন কি, আমার বিয়ে করা সম্রাজ্ঞীকেও ধরে রাখতে পারিনি।

সেই আধুনিক এক ছোক্‌রা সেনাপতিকে বিয়ে করে কেটে পড়ে যাবার আগে অবশ্য আমার খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আমাকে হত্যা করে।

সঙ্গে সঙ্গে জুজু সম্মানে সম্রাট সুং-চেং-সুংকে থামতে অনুরোধ করে।

বলে, আজকে এ পর্যন্ত থামলেই আমরা উপকৃত হব সম্রাট। দরকার হলে আবার আপনার স্মরণাপন্ন হব মহামান্য সম্রাট সুং-চেং-সুং। এবার আপনি দয়া করে স্থান ত্যাগ করতে পারেন

সম্রাট সুং-চেং-সুং চলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে জুজু আবার হাতে তুড়ি বাজায়।

মোটা মহাবোধি জাতকের বইয়ের ভেতর থেকে ভগবান বুদ্ধদেব বেরিয়ে আসে।

তার সমস্ত দেহ সোনায় মোড়া।

এমন কি, হাত পা গুলো সোনার তৈরী।

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাং হাত জোড় করে মাটিতে বসে পড়ে।

প্রণাম করে বলে, প্রভু, আপনার এ অবস্থা কেন?

বুদ্ধদেব বিনয়ের হাসি হাসে।

বলে, আমি যতদিন জীবিত ছিলাম, ততদিন প্রত্যেককে উপদেশ দিয়েছি, আমার অবর্তমানে মূর্তি কিংবা পট দিয়ে আমাকে পূজো করার কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আমার মৃত্যুর পর পৃথিবীতে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়।

চারদিকে আমার ভক্তেরা আমার মূর্তি তৈরী করে দেব দেবীর নামের সঙ্গে আমার নাম জুড়ে দিয়ে হৈ হৈ শুরু করে দেয়।

একটা কথা আমার যে সব মূর্তি তৈরী হয়েছে, তা দেখতে সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে।

আসলে আমার দেহ অত সুন্দর ছিল না।

উপোষ করে করে আমার দেহে মাংস বোধ হয় অবশিষ্ট ছিল
আমি হাড্ডিসার হয়েছিলাম।

আমার গাল ও অক্ষিকোটর বসে গিয়েছিল।

অবশ্য সুজাতার পায়েস খেয়ে আমি তৃপ্তি লাভ করেছিলাম

কিন্তু আমার গায়ে কখনই মাংস হয়নি।

তাই আমি ঠিক করেছি, আমার ভক্তদের আকুল ডাকে আমি সাড়া দেব। এই মূর্তিতে আমি তাদের দেখা দেব।

বুদ্ধদেব কথা বলতে বলতে যখনই সামান্য সময়ের জন্য চুপ করে, সঙ্গে সঙ্গে ঝুজু বলে ওঠে, আচ্ছা প্রভু। একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। আপনি কি তার উত্তর দেবেন?

বুদ্ধদেব সামান্য হেসে বলে, সম্ভব হলে নিশ্চয়ই দেব

—আচ্ছা বলুন তো প্রভু, বই পড়া ভাল কি মন্দ?

বুদ্ধদেব নিজের সোনার দাঁত বের করে হাসে।

বলে, বেঁচে থাকার সময় অন্যের দুঃখে আমার মন কেঁদে উঠতো।

তাই বেদ, পুরান, উপনিষদ ইত্যাদি ধর্ম গ্রন্থের পাতায় খুঁজেছি মানুষের মুক্তির পথ।

কিন্তু এখন দেখছি সবটাই গাল ভরা কথা। ভাওতায় ভরপুর।

যে বইটা থেকে বুদ্ধদেব বেরিয়ে আসে, সেই বইটার দিকে আঙুল তুলে বুদ্ধদেব বলে, ঐ যে মোটা বইটা সযত্নে রাখা হয়েছে ঐ বইটা কি আমি লিখেছি?

আমার নাম করে যত সব আজে বাজে কথা লিখেছে আমারই কোন ধাপ্পাবাজ ভক্ত।

অবশ্য বইটা বিক্রি করে সে ভাল পয়সা করেছে।

এমন কি, আমার বাবার দেওয়া সিদ্ধার্থ নাম শিকেয় তুলে আমাকে প্রচার করা হয়েছে বুদ্ধ বলে।

আগা গোড়া সবটাই ফালতু।

সঙ্গে সঙ্গে ঝুজু বুদ্ধদেবকে প্রণাম করে।

বলে, আর আপনাকে কষ্ট দেব না প্রভু। এবার আপনি আসতে পারেন।

এবারও বুদ্ধদেব সেই মোটা বইয়ের মধ্যে আশ্রয় নেয়।

ঝুজু আবার হাতের তুড়ি বাজায়।

হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয় জুজুর।

সে অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে।

ল্যাং কে প্রশ্ন করে, এবার বল, আর কার কথা শুনলে আমার তোমার বিশ্বাস হবে?

ল্যাং ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

বলে, না, না, আর কাউকে ডাকার প্রয়োজন নেই। আমি এক্ষুনি পুরোনো বই কেনার লোককে ডেকে আনছি।

ল্যাং একটা পুরোনো বই কেনার লোক আনে। লোকটার নাম কোয়াং ভিং।

টনটন কাগজ ও বই, দেখে লোকটা অনেকক্ষ আত্মহারা হয়ে ওঠে।

জুজু কিন্তু সব সময় ল্যাং এর পেছনে থাকে।

বই কেনার লোকটা অবশ্য জুজুকে দেখতে পায় না।

বই কেনার লোকটা অর্থাৎ কোয়াং ভিং এতগুলো বইয়ের দাম দেয় মাত্র পঞ্চাশ টাকা।

ল্যাং বাজার দর জানে না। তাই সে কি করবে ভেবে পায় না।

পেছন থেকে জুজু ল্যাং এর কান ভাল করে মুলে দেয়।

বলে, বুদ্ধ কোথাকার। বইগুলোর দাম চাও দু শ টাকা।

কান মলা খেয়ে ল্যাং কঁকিয়ে ওঠে।

বলে, বড্ড লাগছে। কান জ্বালা করছে।

কোয়াং ভিং অবাক হয়।

ভাবে, ঘরে তো কেউ নেই। তবে ল্যাং কার সঙ্গে কথা বলছে?

এদিক ওদিক তাকিয়ে কোয়াং ভিং ঘরে কাউকে দেখতে পায় না।

ভাবে, পড়তে পড়তে ছেলেটার মাথা গোল্লায় গেছে। কাজেই, ব্যবসার সময় ওদিকে নজর দিলে চলবে না।

কোয়াং ভিং কে কোন কথা বলতে না দেখে ল্যাং বলে, না বাপু,

পঞ্চাশ টাকায় এতগুলো বই দেওয়া সম্ভব নয়। নগদ দু'শো টাকা দিলে তবেই বইগুলো হাত ছাড়া করব।

কোয়াং তিংও কোন প্রতিবাদ করে না। মনে মনে বইগুলোর হিসাব করে। তারপর ল্যাং এর প্রস্তাবে সায় দেয়।

ল্যাং ভূতের বইটা হাত ছাড়া করতে ইতঃস্তত করে।

সঙ্গে সঙ্গে জুজু ল্যাং এর মনের কথা বুঝতে পারে।

সে আবার ল্যাং এর কানের কাছে নিজের মুখখানা আনে।

ফিস ফিস করে বলে, ভূতের বইটা বিক্রি করে দাও। তা না হলে আমার মত নানান ভূতেরা এখানে এসে আড্ডা মারবে। ভূতের নাচন শুরু করবে। তখন কিন্তু তাদের সামলাতে নাকের দড়ি ছিঁড়ে যাবে।

সব কাগজ ও বই বিক্রি করে ল্যাং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা পায়।

পুরোনো আলমারী, বইয়ের র‍্যাক ইত্যাদি বিক্রি করে আরও দুহাজার টাকা পায়।

জুজুর পরামর্শে ল্যাং নিজের পুরোনো বাড়ীটা সংস্কার করে।

বছরের খাবার দাবার পাওয়ার জন্য ল্যাং বাড়ীর কাছাকাছি পাঁচ একর ধান জমি কিনে ফেলে।

তারপর জুজুর কথা মত বাড়ীর ঘরগুলো সুন্দর করে সাজায়।

জানালা ও দরজায় বাহারী পর্দা ঝোলায়। দেওয়ালে নানান রকম সুন্দর ছবি টাঙ্গায়।

ঘরে আয়না, আতর ও বাতিদানের ব্যবস্থা করে।

ফলে ল্যাং এর পুরোনো বাড়ীর জৌলুস একেবারে পাল্টে যায়।

জুজুর কথা মত ল্যাং জেলার বড় বড় সরকারী কর্তাব্যক্তিদের নেমন্তন্ন করে।

সময় মতন সু ইং, সুং সো, ওয়াং ডু ইত্যাদি বাঘা বাঘা সরকারী কর্তাব্যক্তিরা ল্যাং এর বাড়ীতে আসে।

ল্যাং তাদের আপ্যায়ন করে, পেট ভরে নানান রকম সুখাদ্য খাওয়ায়।

সকলেই ল্যাং-এর অভ্যর্থনায় খুশী হয়।

কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন তো বলেই ফেলে, আরে, আপনার মত এ রকম একজন কর্মিৎকর্মা লোক যে এ জেলায় ছিল, তা আমরা আগে ঘুনাক্ষরেও টের পাইনি!

চিং পে তো সোজাসুজি রসিকতা করে বসে।

বলে, আরে ল্যাং, আপনার মত লোকের এখন ছুটো জিনিষের অভাব বোধ করা উচিত।

ল্যাং তো ভেবেই পায় না, তার এখন কোন জিনিষের অভাব আছে।

ল্যাংকে বিব্রত হতে দেখে চিং পে প্রাণ খোলা হাসি হাসে।

বলে, বিব্রত হবার কিছু নেই ল্যাং। ব্যাপারটা খুবই সহজ। তা হল, এখন আপনার বাড়ীতে একটা পছন্দ সই লাইব্রেরী ও বই-এর বিশেষ প্রয়োজন।

চিং পে এর কথায় উপস্থিত সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। চিং-পে এর রসিকতাকে সমর্থন জানায়।

জুজু চিং পে এর কথায় ল্যাং-এর পেছনে থেকে হাসে।

তবে কেউই জুজুর হাসি দেখতে পায় না।

ল্যাং বিজ্ঞের মত বলে, লাইব্রেরী মানে একগাদা জঞ্জাল বাড়ীতে রাখা। ছিম ছাম বাড়ীতে কি এত জঞ্জাল ভাল লাগে?

চিং পে ল্যাং এর কথা মেনে নিতে পারে না।

সে বলে, বইয়ের সব জিনিষ কি মনে রাখতে পারেন?

—কিছু কিছু ল্যাং উত্তর দেয়।

—অন্ধ?

—বললাম তো, কিছু কিছু।

—বেশ, বলুন তো বাইশ হাজার একশো চব্বিশকে দশ হাজার তিনশো সাতানব্বই দিয়ে গুণ করলে গুণফল কত হয় ?

চিং পে এর প্রশ্ন শুনে ল্যাং এর গায়ে ঘাম ছোটে।

সে অসহায়ের মত পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা জুজুর দিকে তাকায়।

জুজু সঠিক গুণফলটা তাকে বলে দেয়।

ল্যাং হাসি হাসি মুখে বলে, অঙ্কটা কিন্তু তেমন কঠিন নয়, কি বল চিং পে ?

চিং পে সমান জোরে বলে, বেশ তো, উত্তরটা দিয়েই প্রমাণ করে দিন, অঙ্কটা খুবই সহজ।

—ছশো তিরিশ কোটি বাইশ হাজার ছশো আঠাশ। ল্যাং হাসতে হাসতে বলে ওঠে।

ল্যাং এর উত্তর শুনে সরকারী কর্তাব্যক্তিদের চোখ কপালে ওঠে।

কুং সো বিস্মিত হয়ে বলে, আরে, আপনার মত গুণী লোক সরকারের কাজে না লেগে শুধু শুধু নষ্ট হচ্ছে ! আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারী কর্তাব্যক্তির পরীক্ষা অতি অবশ্য দিন।

তা না হলে সরকার আপনার সেবা থেকে বঞ্চিত হবেন।

ফলে, সকলের অনুরোধে ল্যাং সরকারী পরীক্ষায় বসে।

জুজু কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে থেকে ল্যাং এর পেছনে সর্বক্ষণ বসে থাকে।

জুজু আস্তে আস্তে ল্যাংকে সব প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়।

ল্যাং সুবোধ বালকের মত প্রশ্নের উত্তর খাতায় লেখে।

এদিকে পরীক্ষা হলে গার্ডদের মেজাজ ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কেন না, সব পরীক্ষার্থী টোকার জন্য গার্ডদের মোটা রকম ঘুষ দিয়েছে।

একমাত্র দেয়নি ল্যাং।

কাজেই, গার্ডরা ল্যাং এর চারদিকে কঠিন নজর রাখে। সুযোগ পেলেই ল্যাংকে ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

যথা সময়ে পরীক্ষার ফল বেরোয়।

দেখা যায় ল্যাং সকলকে টেক্কা মেরে প্রথম হয়েছে।

আগে থেকে সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের হাতে রাখায়, ল্যাং নিজের জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী পায়।

গার্ডদের কিছু না দেওয়ায় জুজু ল্যাংকে অভিযোগ করে

কেন না, সে চায় না কারও মনে আঘাত করতে।

ল্যাং বিজয়ের হাসি হাসে।

বলে, তোমার জন্যই তো উৎরে গেলাম। তা না হলে অত সব কঠিন কঠিন প্রশ্নের উত্তর কি আমি লিখতে পারতাম?

তাছাড়া, ভূতের গল্প পড়েছিলাম বলেই তো তোমাকে পেয়েছি। আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেছে।

জুজু কপট অভিমানের স্বরে বলে, থাক, আর জ্ঞান দিতে হবে না।

ল্যাং চিন্তিত ভাবে বলে, না, তোমাকে জ্ঞান দেবার জ্ঞান আমার নেই।

তবে একটা কথা ভেবে আমি খুবই চিন্তিত।

—কোন কথা? জুজু ব্যস্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করে।

—কথাটা হল, অধিকাংশ শুভাকাঙ্খীর বক্তব্য, নূতন ম্যাজিস্ট্রেটের বউ নেই কেন?

সঙ্গে সঙ্গে জুজু ফোঁস করে ওঠে।

রাগত স্বরে বলে, তোমার জ্যান্ত বউ কখনই হতে দেব না।

আমার কথা না শুনলে, তোমার জ্যান্ত বউয়ের ঘাড় মটকে দেব।

—তা হলে আমাকে কি করতে হবে? ল্যাং ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে।

—এই তো সুবোধ বালকের মত কথা। এবার মনযোগ দিয়ে শোন, তোমাকে কি করতে হবে।

প্রথমে তুমি গোরস্থানে যাবে। সেখানে কোন সুন্দরী যুবতীর মৃত দেহ পছন্দ করবে।

তারপর আমি সেই মৃত সুন্দরীর দেহের ভেতরে প্রবেশ করবো।

যুবতীটি বেঁচে উঠবে। সে তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে। আর তুমি তাকে বিয়ে করবে।

তাতে লোক দেখানো তোমার বউ হবে। আর আমাকে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে না।

ব্যাপারটা মনের মত না হলেও ল্যাং এর পক্ষে জুজুর অবাধ্য হওয়া সম্ভব নয়।

তাই সে প্রায় প্রতিদিন একবার করে গোরস্থানে যায়। কবর দেবার জন্য আনা মৃতদের ভাল করে লক্ষ্য করে।

জুজু কিন্তু এ ব্যাপারেও ল্যাং-এর সঙ্গে রসিকতা করতে ছাড়ে না।

একদিন গোরস্থানে একটি বৃদ্ধার মৃত দেহ দেখিয়ে জুজু গম্ভীর ভাবে ল্যাং এর কানের কাছে মুখ এনে বলে, এই মহিলাটিকে বিয়ে করলে কেমন হয় ?

ল্যাং ভয়ে দু পা পেছিয়ে যায়।

বলে, দোহাই তোমার। এই বৃদ্ধাকে নিয়ে রসিকতা কোরো না। আজীবন বিয়ে না করলেও, এই বৃদ্ধা মহিলাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

পরে একদিন একটি যুবক ও একটি বৃদ্ধের মৃতদেহ গোরস্থানে আসে কবর দেবার জন্য।

সেদিনও ল্যাংকে বিফল মনরথ হয়ে বাড়ী ফিরতে হয়।

একদিন একটা সাদা ধবধবে কফিন করে একটি সুন্দরী যুবতীকে গোরস্থানে কবর দেবার জন্য আনা হয়।

যুবতীটির বাবা, দাদা ইত্যাদি আত্মীয় স্বজনেরা যুবতীটির অকাল বিয়োগের জন্য ভীষনভাবে কান্নাকাটি শুরু করে।

ল্যাং পায়ে পায়ে কফিনটির একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায়।

দেখে যুবতীটি অনেকটা পরীর মত দেখতে। বড় চোখ দুটো টানা টানা। ছোট্ট কপালের ওপর মাথার কোঁকড়ানো চুলের দু এক গাছি এসে পড়েছে। টিকোল নাক। তার নিচে পদ্মের পাপ্‌ড়ীর মত পাতলা এক জোড়া ঠোঁট। গায়ের রং দুধে আলতার মত।

জুজু ল্যাং এর কানে কানে বলে, এই সুন্দরী যুবতীটি কি তোমার পছন্দ ?

ল্যাং আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ায়। সম্মতি জানায়।

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাংকে বিয়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে উপদেশ দেয় জুজু।

তারপরেই জুজু হাওয়ার সঙ্গে সুন্দরী যুবতীটির দেহের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

যুবতীটি দুচোখ খোলে। কাকে যেন খুঁজতে থাকে।

চোখ খোলার পর দেখা যায় যে, যুবতীটির দুটো চোখ ট্যারা।

ল্যাং তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে যুবতীটির পায়ের কাছে যায়।

যুবতীটি ল্যাংকে দেখে কফিনের ভেতরে উঠে বসে।

কাকেও কোন কথা না বলে ল্যাং-এর কাছে আসে। তাকে ল্যাং এর বাড়ীতে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে।

যুবতীটির বাবা দাদারা তাকে বাধা দেয়।

যুবতীটি তাদের কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না। ল্যাং-এর সঙ্গে তার বাড়ীতে আসে।

যুবতীটির বাবা দাদারে ও ল্যাং এর বাড়ীতে আসে। যুবতীটিকে তাদের সঙ্গে ফিরে যেতে অনুরোধ জানায়।

বলে, তাটম সিয়েন আমার মেয়ে। ওর সঙ্গে ওর মাসতুতো ভাই ট্যাংলীর বিয়ে সব ঠিক ঠাক।

কাজেই, তাটম সিয়েনকে যদি ছেড়ে দেন তবে খুব ভাল হবে।

ল্যাং কিছু বলার আগেই তাটম সিয়েন মুখিয়ে ওঠে।

বলে, আমি ল্যাংড়া, বেঁটে ও আফিম খোরকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না।

তোমরা এখান থেকে বিদেয় হলে আমরা বাঁচি।

তাটম সিয়েনের বাবা দাদারা তাকে অনেক বোঝায়।

কিন্তু তাটম সিয়েন ল্যাং ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে রাজি হয় না।

অগত্যা তাটম সিয়েনের বাবা দাদারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ীতে চলে যায়।

তারপর কিন্তু তাটম সিয়েনের বাবা দাদারা নিরাশ হয় না।

তারা আদালতের শরনাপন্ন হয়।

অভিযোগ করে, ল্যাং তাটম সিয়েনকে গুনতুক করেছে। তাকে ল্যাং এক রকম জোর করে তার বাড়ীতে আটকে রেখেছে।

যেদিন মামলা আদালতে ওঠে, সে দিন উৎসুক জনতা আদালতের ঘর ভর্তি করে ফেলে কোথাও তিল রাখার জায়গা নেই।

সকলের মনে একই চিন্তা, বিচারের রায় কোন দিকে যাবে।

প্রথমে সরকারপক্ষ মামলা হাতে নিতে চায়নি।

কিন্তু চীনের আইন বড্ড কড়া। তার ন্যায় বিচার থেকে কেউই রেহাই পায় না।

আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেট তাটম সিয়েনকে প্রশ্ন করে, তোমার বাবা দাদার অভিযোগ যদি মেনে নেই, তা হলে তুমি তো নিজেকে বাঁচবার জন্য চিৎকার করে পাড়া প্রতিবেশীকে জড়ো করতে পারতে। পালাতেও পারতে। তা করনি কেন?

তাটম সিয়েনের ট্যারা চোখ জোড়া উত্তেজনায় আরও ট্যারা হয়ে যায়।

সে বেশ জোরের সঙ্গে বলে, ল্যাং আমাকে কখনও গুনতুক করেনি। জোর করে আমাকে তার ঘরে আটকে রাখেনি। আমি

স্বেচ্ছায় তার কাছে গেছি বিয়ে করতে। পালিয়ে যেতে নয়। কাজেই, ল্যাং, আমার আইন সম্মত স্বামী। আমি ওর স্ত্রী।

বিচারক এক কথায় মামলা খারিজ করে দেয়।

সঙ্গে বলে, সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের নামে কুৎসা রটানো গুরুতর অপরাধ। বিচারে ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে।

কাজেই, প্রথম বার বলে আমি অত কঠিন শাস্তি তোমাকে দিতে চাই না।

পরের বার যদি এ রকম বেয়াদপী দেখি, তাহলে কড়া শাস্তি দিতে কখনই দ্বিধা করব না।

আদালত থেকে ল্যাং তাটিম সিয়েনের সঙ্গে বাইরে বের হয়

ল্যাংকে মনে হয় তাহাদের পেছনে ল্যাংবোটের মত।

ল্যাং ভাল করেই বুঝতে পারে যে, মুজু ওরকে তাটিম সিয়েন এ জীবন থাকতে ল্যাংকে রেহাই দেবে না। কাজেই, ওর কাছে আত্মসমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত

— —

অভিশপ্ত লণ্ডন-টাওয়ার

আর থার্নটন হপকিনস্

লণ্ডন টাওয়ার কথা অনেকে অনেকভাবে পাঠক সমাজে তুলে ধরেছে।

আমরা আজকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলবো।

সে সময় লেখক ই, এল, সুইফ্‌ট বিখ্যাত জ্যাইজুয়েলের রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়।

সে মার্টিন টাওয়ারের জুয়েল হাউসে সপরিবারে থাকতো।

পরিবার বলতে ই, এল, সুইফ্‌টের ছিল স্ত্রী, বৌদি ও সাত বছরের একটি ছেলে।

একদিন ই. এল, সুইফ্‌ট সপরিবারে রাত্রের খাবার খেতে বসেছে।

সময়টা ছিল শীত কাল।

স্বভাবতই ঘরের জানালা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

বন্ধ জানালায় মোটা ভারি পর্দা ছিল টেবিলের ওপরে মোমবাতি জ্বলছিল।

সকলে খেতে খেতে গল্পে মশগুল হয়েছিল।

সে সময় ই, এল, সুইফ্‌টের স্ত্রী আর্তনাদ করে ওঠে।

ঘরের দেওয়ালের দিকে আঙুল তুলে কি যেন ইঙ্গিত করে।

স্বভাবতই সকলে ই, এল, সুইফ্‌টের স্ত্রীর নির্দেশিত ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকায়।

দেখে, দেওয়ালে স্বচ্ছ একটা টিউবে শাদা ও ফিরোজা সবুজ রঙের তরল পদার্থ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক এক সময় তরল পদার্থগুলো মিশছে, আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

সেই টিউবটার সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে টিউবটা সচল হয়ে ওঠে।

টিউবটা আস্তে আস্তে দেওয়াল থেকে নিচে নামতে শুরু করে।

এভাবে নামতে নামতে টিউবটা ই. এল. সুইঘণ্টের খাবার টেবিলের কাছে আসে।

একটু পরে সেই টিউবটা খাবার টেবিলের চার পাশে বেশ কয়েকবার ঘুরে বেড়ায়।

তারপর টিউবটা ই. এল. সুইঘণ্টের বৌদি ও ছেলের সামনে দিয়ে নড়াচড়া করে।

পরক্ষণে টিউবটা ই. এল. সুইঘণ্টের স্ত্রীর পেছনে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

ই. এল. সুইঘণ্টের স্ত্রী টিউবটা দেখতে না পেলেও, টিউবটার অস্তিত্ব বেশ অনুভব করতে পারে।

সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠে।

ই. এল. সুইঘণ্টের স্ত্রীর চিৎকারে টাওয়ারের লোক ও বাইরের লোক খাবার ঘরে ছুটে আসে।

কিন্তু কেউই সেই চলন্ত টিউবটা দেখতে পায় না।

তারপর আর কেহ সেই টিউবটাকে দেখতে পায় না।

গ্রীন টাওয়ারের মধ্যে কুখ্যাত বেগম টাওয়ার আছে।

এই টাওয়ারে ফাঁসীর আসামীদের রাখা হত।

এই সব আসামী মৃত্যুর আগে নানান সব রোমহর্ষ কথা দেয়ালে লিখে রাখতো।

এই টাওয়ারের চার্চে কবর দেওয়া হয় কুখ্যাত আসামী এ্যান বলিনকে।

যে রাত্রে আসামী কার্স লোডি গুলিবিদ্ধ হয়, তার আগের রাত্রে মৃতা এ্যান বলিনকে অনেকে দেখতে পায়।

এ্যান বলিন সকলের মাঝখান দিয়ে সাদা পোষাকে আপাদ-মস্তক ঢেকে হেঁটে চলে যায়।

তার পরেই সে একটা মোটা থামের মধ্যে অদৃশ্য হয়।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এক শীতের রাত্রে যে ঘরে এ্যান বলিন ফাঁসীর আগের দিন কাটিয়েছিল, ঠিক তার নিচে লেফ্‌টানেন্ট লজিং এর সামনে পাহারারত সৈনিকটিকে দেখতে পাওয়া যায় না।

খোঁজা খুঁজির পর তাকে পাওয়া যায় বরফ ঢাকা একটা চাতালে অজ্ঞান অবস্থায়।

কেহই সৈনিকটির প্রকৃত অজ্ঞানের কারণ খোঁজ করে না।

সকলের বক্তব্য সৈনিকটি তার কর্তব্যে অবহেলা করেছে। কাজেইতার সামরিক বিচার হওয়া উচিত।

বিচারের সময় সৈনিকটি কাতর নয়নে সে রাত্রের অবিশ্বাস যোগ্য ঘটনার কথা বলে।

বলে, পাহারার রাত্রে সে নিয়ম মত পাহারা দিচ্ছিল যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে।

এক সময় সে দেখে যে, একটা সাদা মূর্তি খুবই সন্তর্পনে তারই দিকে আসছিল।

সে নিজের বন্দুক তুলে সাদা মূর্তিকে থামতে আদেশ করে।

সাদা মূর্তিটাতো থামে না। বরং একটা তীব্র আলো সৈনিকের বন্দুকের নলে ঢুকে তার বন্দুক ধরে থাকা হাত ঝলসে দেয়।

—তারপর? এবার জুরীরা কৌতুহল অনুভব করে।

—তারপর আমি ভয়ে বন্দুক ফেলে দিই।

—তুমি বন্দুক ফেলে দিলে?

—হ্যাঁ।

—টাওয়ার অফ লণ্ডনের গার্ড জীবিত থেকে হাতের বন্দুক ফেলে দেয়, এটা চিন্তা করাও অন্যায়। এর উপযুক্ত বিচার হওয়া প্রয়োজন।

পরে বলে, বলতে পার, কে সেই সাদা মূর্তি?

—হ্যাঁ বলতে পারি। সে একটা অদ্ভুৎ আকৃতির পুরোনো বনেদি টুপি পড়ে ছিল। অবশ্য টুপির মধ্যে তার মাথা ছিল না।

সৈনিকটির বক্তব্যকে প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেয় আদালত ঘরের সকলে।

কিন্তু টাওয়ারের কয়েকজনের সাক্ষীতে সৈনিকটি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

তাদের মধ্যে একজন হল লেফটানেন্ট লজিং এর একজন অফিসার।

সে বলে, শুতে যাবার সময় সে জানালা দিয়ে দেখে সত্যিই সাদা পোষাকে আবৃতা একটি প্রেতমূর্তি সৈনিকটির দিকে এগোতে থাকে।

সৈনিকটি যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে নিজের বন্দুক নিশানা করে প্রস্তুত হয়।

সাদা মূর্তিটিকে প্রশ্ন করে, সে কে?

তারপরেই সৈনিকটি হাতের বন্দুক ছুড়ে ফেলে।

সে কাঁপতে শুরু করে।

টলতে টলতে সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চেষ্টা করে।

পরে সে বরফ ঢাকা চাতালে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় সাক্ষী হল সেন্টপিটার এডভিনকুলার চ্যাপেলের পদস্থ গার্ড অফিসার।

সে বলে, ঘটনার দিন সে সঙ্গী সাথী নিয়ে চ্যাপেলে নিয়ম মত পাহারা দিচ্ছিল।

অনেক রাতে সে শোনে যে চ্যাপেলের ভেতরে কে যেন মন্ত্র উচ্চারণ করছে।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে, চ্যাপেলের ভেতর থেকে অদ্ভুৎ নীল বর্ণের আলো দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে এসে পড়েছিল।

কিন্তু অবাক ব্যাপার হল, তখন চ্যাপেলের দরজায় বিরাট তালা লাগানো ছিল।

এ অবস্থায় বাইরের লোক কি ভাবে চ্যাপেলের ভেতরে ঢুকতে পারে, তা মাথায় আসে না অফিসারটির।

অনেক পরামর্শ করেও সঠিক কোন পথ বের করতে পারে না সে।

কাজেই, সে সহকর্মীদের একটা বড় মই আনতে আদেশ করে।

সহকর্মীরা মই আনলে অফিসারটি মইটা চ্যাপেলের একটা আধ খোলা জানালার সঙ্গে দাঁড় করায়।

অফিসারটি মই বেয়ে জানলার সামনে যায়। জানালা দিয়ে চ্যাপেলের ভেতরের আসল ব্যাপার বুঝতে চেষ্টা করে।

সে দেখে, চ্যাপেলের ভেতরে নীলাভ আলোয় একদল মহিলা ও একদল পুরুষ লাইন করে চ্যাপেলের ভেতরে বসার আসনগুলোর মাঝখানের রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছে।

সকলের পরনে ছিল টিউডর আমলের পোষাক।

শোভাযাত্রার সামনে একজন সুন্দরী মহিলা ঝকমকে গয়না পড়ে যাচ্ছিল মাথায় ছিল একটা বড় হীরার গহনা।

একটু ভাল করে দেখার পর অফিসারটি মহিলাটিকে চিনতে পারে।

কেন না, কিছুদিন আগে সে ফ্রান্সের একটা খুবই পুরোনো দুর্গে গিয়েছিল।

সেখানে একটা সুন্দর তৈলচিত্রের নিচে এ্যান বলিনের নাম লেখা ছিল।

সেই তৈল চিত্রটির কথা স্মরণে রেখে অফিসারটি চ্যাপেলের সেই সুন্দরী মহিলা যে সেই এ্যান বলিন তা সে জোর করে বলে।

সেই দৃশ্য অফিসারটিকে এমন আকৃষ্ট করে রেখেছিল যে, সে চ্যাপেলের ভেতর থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি। নিচে নামা তো দূরের কথা।

তারপর যখন একে একে চ্যাপেলের সব কটা আলো নিভে যায় ও উপস্থিত নারী পুরুষ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, তখন সে সম্বিদ ফিরে পায়। মই বেয়ে নিচে নেমে আসে।

এ ছাড়াও এ্যান বলিনকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়।

এই এ্যান বলিনকে ব্যভিচারের অপরাধে বন্দী করে আনা হয়।

তাকে রাখা হয় টেমস নদীর ধারে নির্জন হ্যামবেথ প্যালেসের মাটির তলার ঘরে।

আর্চ বিশপ ক্যানমোর তাকে মৃত্যু দণ্ড দেয়।

এ্যান বলিনের মৃত্যুর, পরও এই প্যালেসের পাশ দিয়ে যাবার সময় মৃতা এ্যান বলিনের কাতর আর্তনাদ শোনা যায়।

সে যেন বলতে থাকে, আমি নিষ্পাপ। আমার ওপর মিথ্যে দোষারোপ করা হয়েছে।

পরে লণ্ডন ইভনিং নিউজের একজন সাংবাদিক এই আলডার ক্রটের উঁচু স্তূপের মত সমাধি খোঁড়ার সময় তার ভেতর থেকে বেশ কয়েকটা কঙ্কাল বের হতে দেখে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, এখানে কত নিরীহ লোককে খুন করে সমাধি দেওয়া হত।

———

পিশাচ

লেডি শিনথিয়া অ্যাসকুইন

কর্নেল হেমবার মাষ্টার বহু দিন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করে।

হালে অবসর নিয়েছে।

নিজের দেশে এসে বাগান ঘেরা নির্জন একটা বাড়ীতে সারা জীবন কাটাবার ব্যবস্থা করে।

অনেক দিন আগেই স্ত্রী মারা যায়।

সংসারে আপন বলতে একমাত্র ছোট্ট মেয়ে মণিকা।

তার দেখা শোনার জন্য ভজসুকা নামে একজন মহিলাকে রাখা হয়েছে।

ভজসুকাও মণিকাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসে। সব সময় তার ভালর কথা চিন্তা করে।

মণিকাও ভজসুকার বাধ্য। ওকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারে না।

এ ছাড়া, কর্নেল হেমবার মাষ্টারের বাড়ীতে আছে রান্না করার লোক ওরাইলী।

কর্নেল হেমবার মাষ্টারের বাড়ীটা এত নির্জন যে, সন্ধ্যের পর বাড়ীর চার পাশের বিরাট অন্ধকার বাগানে তাকালে ভয়ে গা শির শির করে ওঠে।

মনে হয় এই বুঝি কোন দুর্ঘটনা বাড়ীটার ওপরে ঝাপিয়ে পড়বে।

বাড়ীর বাইরে কোন শব্দ হলে বাড়ীর লোকেরা চম্‌কে ওঠে।

অজানা আতঙ্কে তাদের মন কেঁপে ওঠে।

ঘটনার দিনটা ছিল শীতের এক রাত্রি।

তার ওপরে বিকেল থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে।

কর্নেল হেমবার মাষ্টার অন্যান্য দিনের মত আজকে বাড়ীর বাইরে গেছে।

অন্ধকারে বাড়ীর চারপাশে প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না।

হঠাৎ রাত দশটার সময় বাড়ীর কলিং বেল কে যেন বেশ জোরেই বাজায়।

শব্দটা এত বিকট হয় যে, বাড়ীর দোতলায় বাচ্চা মেয়ে মণিকা ভয় পেতে পারে।

তাই রান্না করার লোক ওরাইলী কোন কিছু না ভেবেই তাড়াতাড়ি বাড়ীর সদর দরজা খুলে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ওরাইলী চমকে ওঠে।

ভয়ে তার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়

ওরাইলী দেখে, দরজার সামনে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একটা অস্বাভাবিক লম্বা, কালো ও রোগা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা সুদৃশ্য মোড়ক।

ওরাইলীর মনে হয় লোকটা নিগ্রো হতে পারে।

নিগ্রোটা একটা বড় কালো আলখাল্লা পরেছিল।

মাথায় ছিল খুবই পুরোনো কালো একটা টুপি।

ওরাইলীকে দেখে নিগ্রো লোক ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসে।

টুপি খুলে অভিবাদন করে।

পরে হাতের সুদৃশ্য মোড়কটা ওরাইলীর দিকে এগিয়ে দেয়

বলে, এই মোড়কটা মাননীয় কর্নেল হেমবার মাষ্টারের জন্য আপনি দয়া করে এটা তাঁকে দেবেন।

ওরাইলী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়।

সে মেশিনের মত নিজের হাত দুটো লোকটার দিকে এগিয়ে দেয়।

লোকটা মোড়কটা ওরাইলীর হাতে দেয়

মোড়কটা দেবার সময় লোকটার আনন্দে তার চোখ জোরা জলন্ত অঙ্গারের মত জলতে থাকে।

একটু পরেই লোকটা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়।

লোকটা অদৃশ্য হলে ওরাইলী সম্বিদ ফিরে পায়।

সে ভীষণ ভয় পায়।

তাড়াতাড়ি সদর দরজা বন্ধ করে মোড়কটা নিয়ে ডজসকার কাছে ছুটে আসে।

ডজসকাকে সব কথা বলে।

তার সঙ্গে এও বলে যে, এই ঝড় জলে লোকটা এসেছিল, কিন্তু তার গায়ে কোন বর্ষাতি ছিল না। গায়ে জল লাগার কোন লক্ষণই ছিল না।

কণ্ঠস্বর ছিল বাজ পড়ার মত কর্কশ। আঙুলগুলো শুকনো বাঁকা বাঁকা

সব মিলিয়ে সাক্ষাৎ যম ছাড়া আর কারও সঙ্গে তুলনা করতে পারে না ওরাইলী।

ডজসকা ও ওরাইলী আজকের রাতের জন্য মোড়কটা লুকিয়ে রাখে আগামীকাল যা হয় ব্যবস্থা করবে বলে স্থির করে।

পরের দিন সকাল বেলা করলেন হেমবাব মাষ্টার অন্যান্য দিনের মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

ডজসকা ও ওরাইলী ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে ব্রাউন কাগজে মোড়া মোড়কটা খোলে।

দেখে মোড়কের ভেতরে পুরোনো একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু নেই

পুতুলটার চুলের কিছু অংশ ছেঁড়া। একটা হাত নেই

এ রকম একটা পুরোনো পুতুল কেউ যে অন্য কাউকে উপহার দিতে পারে, তা ভেবে পায় না ডজসকা ও ওয়াইলী

ডজসকা ও ওয়াইলী পুতুলটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না

পুতুলটাকে আগের মত ব্রাউন কাগজে জড়িয়ে রেখে দেয় ডজসকা।

তাদের আড্ডা থেকে অনেক রাত করে ফেরে কর্নেল হেমবার মাষ্টার সে সময় সে প্রকৃতিস্থ থাকে না। নেশায় ডুবে থাকে

কাজেই, সে সময় কর্নেল হেমবার মাষ্টারকে মোড়কটা দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

পরের দিন সকালে যাতে কর্নেল হেমবার মাষ্টারের চোখে মোড়কটা পড়ে, সে জন্য ডজসকা মোড়কটা হেমবার মাষ্টারের ঘরের ড্রয়ারে রাখে

পরে মোড়কটাকে তেমন গুরুত্ব না দেওয়ায় ডজসকা ও ওয়াইলী মোড়কটার কথা ভুলে যায়

একদিন সকালবেলা হেমবার মাষ্টার ডজসকা ও ওয়াইলীকে ডেকে পাঠায়।

দুজনে কর্নেল হেমবার মাষ্টারের ঘরে যায়।

হেমবার মাষ্টার ড্রয়ার থেকে মোড়কটা বের করে। মোড়কের ভেতর থেকে পুতুলটা বের করে।

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

সে মৃদু কাঁপতে শুরু করে।

বলে, কে, কে এই পুরোনো পুতুলটা আমার ড্রয়ারে রেখেছে ?

ডজসকা আমতা আমতা করে বলে, না, মানে, আজ্ঞে আমি রেখেছি।

—তুমি !

—হ্যাঁ স্যার। আমি।

—পুতুলটা কোথা থেকে পেলে ?

—ওরাইলীকে কে যেন দিয়ে গেছে।

—ওরাইলীকে ?

ওরাইলী এবার একটু এগিয়ে যায়।

বলে, হ্যাঁ স্যার। কয়েকদিন আগে রাত্রে একটা ভয়ঙ্কর দেখতে লোক এই পুতুলের মোড়টা আপনাকে দেবার জন্য দিয়েছিল।

পরে লোকটাকে অনেক খুঁজলাম। কিন্তু লোকটা গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হওয়ায় ওকে ধরতে পারলাম না।

তাই মোড়কটা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপনার টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছি স্যার।

কর্নেল হেমবার মাষ্টার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে, এক্ষুণি পুতুলটা বাড়ী থেকে বাইরে নিয়ে যাও।

পুতুলটাকে পুড়িয়ে ফেল।

তবে সাবধান, মণিকা যাতে কোন মতেই পুতুলের কথা না শুনতে পায়।

তোমরাও স্নেহবশে মণিকাকে কোন দিন কোন পুতুল কিনে দিও না।

তা না হলে এ বাড়ীতে সর্বনাশ নেমে আসবে। কেউ রক্ষা পাবে না।

সর্বনাশের কথা শুনে ডজসকা ও ওরাইলী থতমত খায়। কি করবে ভেবে পায় না।

এবার হেমবার মাষ্টার ধমক দেয়।

বলে, বললাম না, পুতুলটাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়ে সকলের চোখের আড়ালে পুড়িয়ে ফেল।

ডজসকা তাড়াতাড়ি পুতুলটা হেমবার মাষ্টারের হাত থেকে নেয়।

ওরাইলীকে সঙ্গে নিয়ে এক ছুটে ডজসকা রান্না ঘরে ছুটে আসে পুতুলটাকে পোড়াতে যায়।

সে সময় বাধা দেয় বাড়ীর একটা ঝি।

সে অনুরোধ করে, পুতুলটা পুড়িয়ে ফেল না মিস্ ডজসকা। ওটা আমাকে দাও। আমার বাচ্চারা খেলবে।

ডজসকা হেমবার মাষ্টারের আদেশের কথা বোঝায় ঝি টিকে।

সঙ্গে সঙ্গে সে বলে, আর একটু পরেই তো আমি বাড়ীর বাইরে যাব।

কাজেই মিঃ মাষ্টার কি করে জানবেন যে, পুতুলটা পোড়ানো হয় নি

ঝি এর অনুরোধ ফেলতে পারে না ডজসকা।

সে পুতুলটা ঝি এর হাতে দিয়ে বার বার সাবধান করে, মণিকা কিংবা মিঃ মাষ্টার যেন পুতুলটার কথা না জানতে পারে।

জানলে কিন্তু আমাদের কারও চাকরী থাকবে না।

ঝি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়।

পুতুলটাকে নিজের পোষাকের পকেটে যত্ন করে ঢুকিয়ে রাখে।

মণিকার খাবার নিয়ে ঝি মণিকার ঘরে যায়।

মণিকার কোন খেলার বন্ধু ছিল না।

এমন কি, খেলার একটা পুতুলও ছিল না।

কাজেই সে, প্রায়ই মন মরা হয়ে নিজের ঘরে শুয়ে থাকে।

বাবার সঙ্গে মণিকার প্রায় দেখা হয় না বললেই চলে।

কেন না, মিঃ হেমবার মাষ্টার সকাল বেলা কর্ম উপলক্ষ্যে যখন বের হয়, তখন মণিকা ঘুমিয়ে থাকে।

রাত্রে যখন ফেরে, তখন কর্নেল হেমবার মাষ্টার প্রকৃতিস্থ থাকে না। আকণ্ঠ মদ খায়।

আর সে সময় মণিকা ঘুমোয়।

তাই সময় পেলে ডজসকা, ওয়াইলীরা মণিকাকে সঙ্গ দেয়

মণিকাকে মুখ শুকনো করে শুয়ে থাকতে দেখে, ঝি খাবারের ট্রেটা টেবিলের ওপরে রাখে। একে একে খাবারের প্লেটগুলো টেবিলের ওপরে ঢ়ুকে রাখে।

সে সময় ঝির পকেট থেকে পুরোনো পুতুলটা ঘরের মেঝেতে পড়ে যায়।

মণিকার দৃষ্টি তা এড়ায় না।

সে তাড়াতাড়ি পুতুলটা মাটি থেকে তুলে পুতুলটাকে আদর করতে শুরু করে।

ঝি ভয় পায়।

সে মণিকার কাছ থেকে পুতুলটা নিতে চায়।

কিন্তু মণিকা কোন মতেই পুতুলটা হাতছাড়া করতে চায় না।

জোর করে পুতুলটা নিতে গেলে মণিকা কান্না জুড়ে দেয়।

বলে, তুমি যে পুতুল কেঁড়ে নিয়েছো, সে কথা আমি বাবা এলেই বলে দেব।

ঝি এবার ভয় পায়।

সে পুতুলটা মণিকাকে দেয়।

বলে, এই পুতুলের কথা কোন মতেই মিঃ মাষ্টারকে বোলনা দিদিমণি।

তা হলে মিঃ মাষ্টার আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।

মণিকা এর প্রস্তাবে রাজী হয়। পুতুলটাকে দুহাতে বুকে চেপে ধরে। পুতুলটাকে আদর করতে থাকে।

ঝি এর মুখে খবর পেয়ে ডজসকা ছুটে আসে মণিকার কাছে।

পুতুলটা দেবার জন্য মণিকাকে অনেক বোঝায়।

মণিকা বলে, আমার একটা খেলার সাথী নেই। এমনকি, খেলা করার একটা পুতুলও নেই।

যখনই বাবাকে পুতুল কিনে দিতে বলি, বাবা সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে দেয়। আজ পর্যন্ত একটা পুতুল কিনে দেয়নি।

তোমরা বুঝতে পাচ্ছ না, আমি সমস্ত দিন কি নিয়ে থাকি?

অনেক চেষ্টা করেও ডজসকা মণিকার কাছ থেকে সেই পুতুলটা নিতে পারে না।

তবে ডজসকা পরিকল্পনা করে, মণিকা ঘুমিয়ে পড়লে, সে পুতুলটা নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।

তাই ডজসকা মণিকাকে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই স্নান ও আহার করিয়ে দেয়।

বিছানায় শুইয়ে দেয়।

মণিকা পুতুলটাকে আদর করে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে জানে না।

ডজসকা তাড়াতাড়ি পুতুলটা নিতে মণিকার ঘরে আসে।

দেখে, মণিকা পুতুলটাকে বুকের ওপর রেখে দুহাতে পুতুলটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে।

ডজসকা পুতুলটা নিতে গেলে মণিকা আরও জোরে পুতুলটাকে চেপে ধরে।

অনেক চেষ্টা করেও ডজসকা মণিকাকে না জাগিয়ে পুতুলকে তার কাছ থেকে নিতে পারে না।

মণিকা যেভাবে পুতুলটাকে আঁকড়ে ধরে ঘুমুচ্ছে, সে অবস্থায় যদি কর্নেল হেমবার মাষ্টার দেখে ফেলে, তবে সব দিক দিয়ে বিপদ আসতে সময় লাগবে না।

প্রতি দিনের মত সে দিনও কর্নেল হেমবার মাষ্টার অনেক রাতে মাতাল হয়ে টলতে টলতে বাড়ী ফিরছিল।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ তার মনে হয়, কে যেন তাকে অনুসরণ করে আসছে।

কর্নেল হেমবার মাষ্টার থমকে দাঁড়ায়।

পেছন ফিরে দেখে কেউ নেই

আবার সে হাঁটতে শুরু করে

এবারও মনে হয় কে যেন দ্রুত পায়ে তাকে অনুসরণ করে

কর্নেল হেমবার মাষ্টার আবার থমকে দাঁড়ায়।

রাগতস্বরে বেশ জোরেই প্রশ্ন করে. কে পেছনে আসছো? সামনে এস।

এবারও কর্নেল হেমবার মাষ্টার কাউকে দেখে না

কেউই কর্নেল হেমবার মাষ্টারের কাছে আসে না কারও পায়ে চলার শব্দ শুনতে পায় না।

কর্নেল হেমবার মাষ্টার এর কি রকম যেন সন্দেহ হয়

তার নেশা ফিকে হয়ে আসে। ভয়ে বুকটা কেঁপে কলমল করে ওঠে।

করনেল হেমবার মাষ্টার পড়ি মড়ি করে বাড়ীর পথ ধরে ছুটতে শুরু করে।

প্রায় বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে, তখনি গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে কালো আলখাল্লা পড়া একটা কালো নিগ্রো তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

নিগ্রোটা হাসতে থাকে

তার ছুরির ফলার মত দাঁতগুলো অন্ধকারে ওঠে।

সে নিঃস্তব্ধতাকে চুরমার করে চিৎকার করে বলে, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ আমার চা-ই।

কর্নেল হেমবার মাষ্টার নিগ্রোটাকে অতি কষ্টে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে বাড়ীর ভেতর ঢোকে।

সশব্দে নিগ্রোটা সমানে বাড়ীর সদর দরজায় ধাক্কা মারছে

আর চিৎকার করে বলছে, প্রতিশোধ আমি নেবোই। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

ডজসকা ছুটে মনিকার ঘরের কাছে আসে।

দেখে, মণিকার ঘরের দরজায় ডজসন্কা অজ্ঞান হয়ে পড়েআছে

মণিকার ঘরে উঁকি মেরে ডজসন্কার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে।

সে বলির পাঁঠার মত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে।

ডজসকা দেখে, মণিকা অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন।

পুতুলটা জীবন আকৃতি ধারন করে মণিকার গলায় মুখ লাগিয়ে রক্ত শুষে খেতে থাকে।

পিশাচের মুখের দুকষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মণিকার বালি-শের ওপরে।

বালিশের ওয়ার মণিকার রক্তে লাল হয়ে গেছে

পরদিন সকালে ডজসকা করনেল হেমবার মাষ্টারের ঘরে যায়।

করনেল হেমবার মাষ্টার অসময়ে ডজসকাকে ঢুকতে দেখে প্রশ্ন বোধক দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকায়।

ডজসকাকে প্রশ্ন করে, আমাকে কিছু বলবে কি ডজসকা?

হ্যাঁ স্যার ডজসকা আস্তে আস্তে উত্তর দেয়।

—কি বলবে বল।

—আমি বলছিলাম, কয়েক দিনের জন্য আমি বাড়ী যেতে চাই।

—হঠাৎ বাড়ী যেতে চাইছো? এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে?

—আজ্ঞে না, কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

—তবে?

খবর এসেছে, আমার বাবা খুবই অসুস্থ। এ সময় আমার একবার বাড়ী যাওয়া দরকার।

মিঃ হেমবার মাষ্টার বেশ চিন্তিত হয়।

বলে, দেখ ডজসকা, তুমি ভাল করেই জান যে, মণিকার মা জীবিত নেই। সেই মায়ের জায়গাটা তুমি অধিকার করছো। তুমি কি সত্যই মণিকাকে স্নেহ কর।

মণিকাও তোমাকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারে না।

তাছাড়া, তুমিই বলছিলে, মেয়েটার শরীর খারাপ। দিনে দিনে কি রকম যেন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

দেহের রক্ত দিনে দিনে কমে যাচ্ছে।

এ অবস্থায় তোমার মনিকাকে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ?

কর্নেল হেমবার মাষ্টারে অসহায় অবস্থা বুঝতে পারে ডজসকা

কিন্তু সে ভয়ে সব কথা বলতে পারে না।

ইতঃস্তত করে বলে, দেখুন মানে ব্যাপারটা হল, তবুও আমাকে একটিবারের জন্য বাড়ী যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন তা না হলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে।

কথা কটা বলতে বলতে ডজসকারের চোখের সামনে গতকাল রাত্রের নারকীয় দৃশ্য ভেসে ওঠে।

সে দেহের কাঁপুনি আয়ত্বে রাখতে পারে না। তা তার দেহে প্রকট হয়ে ওঠে।

ডজসকারের কাপুনি দেখে কর্নেল হেমবার মনে করে সত্যিই বোধ হয় ডজসকারের বাবা ভীষন অসুস্থ।

তাই সে বলে, বেশ যেতে যখন চাইছো, তখন যাও! তাড়াতাড়ি এলে ভাল হয়।

ডজসকা সেদিনই বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

তবে তার মন পড়ে থাকে অসহায় মনিকার ওপর।

বাড়ীতে গেলে ডজসকার সৎ বাবা তাকে স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারে না।

সে ভীষন রেগে যায়।

ভাবে, ডজসকা বোধ হয় তার ঘাড়ে বসে খেতে এসেছে।

তাই সে ডজসকাকে ভীষন গালমন্দ করে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলে।

অসহায় মা স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে না।

ফলে ডজসকা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাপের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্নেল হেমবার মাষ্টারের বাড়ীতে আসতে বাধ্য হয়।

কর্নেল হেমবার মাষ্টারের বাড়ীতে এসে বুঝতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে কর্নেল হেমবার মাষ্টারের বাড়ীতে অনেক অঘটন ঘটে গেছে।

আগামী দিনে যে আরও দুর্ঘটনা ঘটবে তা তার মন বলে ওঠে।

কর্নেল হেমবার মাষ্টারের বাড়ীতে এসে সে দেখে, ওরাইলী ও বাড়ীর ঝি দুজনের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে ফিসফিস করে কি যেন আলোচনা চলছে!

ডজস্কা ও ওরাইলী পরামর্শ করে ঠিক করে যে, আজকের রাতে যে করে হোক, দুজনে মিলে মণিকার ঘরে যাবে।

ঘুমন্ত অবস্থায় মণিকার কাছ থেকে শয়তান পুতুলটাকে নিয়ে আসবে। আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে।

কর্নেল হেমবার মাষ্টারের বাড়ী থেকে চিরদিনের জন্য পিশাচকে দূর করে দেবে।

গভীর রাতে ডজস্কা ও ওরাইলী বেড়ালের মত নিঃশব্দে মণিকার ঘরের দরজার সামনে যায়।

দেখে, একটা বিভৎস নারী মূর্তি মণিকার পুতুল থেকে বের হয়

সে ঘরের ভেতরে কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

মণিকা ঘুমন্ত অবস্থায় নারী মূর্তির সঙ্গে কথা বলে যায়।

এক সময় মণিকা বলে, তুমি শুধু শুধু খুঁজছো। তুমি যা খুঁজছো, তা আমার ঘরে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে নারী মূর্তি মণিকার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

তার আগুনের ভাটার মত চোখ জোড়া দিয়ে এক ঝলক যেন আগুন বেরিয়ে আসে।

সে দাতে দাঁত চেপে বলে, অসম্ভব নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

তোমরা কোথাও লুকিয়ে রেখেছো

যতদিন ওটা ফিরে না পাব, ততদিন তোমার দেহের রক্ত খেয়ে তোমাকে শেষ করে ফেলবো।

তোমার পরে তোমার বাবা কর্নেল হেমবার মাষ্টারের পালা।

তার ওপর প্রতিশোধ নেবই নেব।

মণিকা যেন উত্তেজিত হয়।

বলে, তুমি এক্ষুণি বাড়ী থেকে চলে যাও।

নারী মূর্তিটির মুখ দিয়ে হিংস্র শব্দ বের হয়।

সে বেশ জোরের সঙ্গে বলে, না, আমি কিছুতেই যাব না।

একবার যখন বাড়ীতে ঢুকতে দিয়েছো, তখন তোমাদের শেষ না করে বাড়ী ছাড়ছি না। কিছুতেই না।

তারপরেই সে পাগলের মত ঘরে কি যেন খুঁজতে শুরু করে।

পরে হিংস্র পশুর মত হাত দু'টোকে থাবার মত করে মণিকার দিকে এগোতে থাকে।

মণিকার কাছে এসে নারী মূর্তি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়।

বলে, একবারে তোমাকে শেষ করবো না।

আস্তে আস্তে তোমার দেহের রক্ত খেয়ে তিলে তিলে তোমাকে মারব।

এরপর ডক্লসকা বুঝতে পারে, নিগ্রোটির দেওয়া পুতুলটা নিশ্চয়ই মন্ত্রপুত পিশাচ

কর্নেলের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য নিগ্রোটা কায়দা করে পুতুলটা কর্নেল হেমবার মাষ্টারের কাছে পাঠিয়েছে।

প্রথমে নিষ্পাপ মণিকাকে মেরে ফেলবে।

তারপর মারবে কর্নেল হেমবার মাষ্টারকে।

কর্নেল হেমবার মাষ্টারের সংসারটা শ্মশানে পরিণত করবে।

পরের দিন ডক্লসকা কর্নেল হেমবার মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করে।

বলে, আমি এসেছি স্যার।

ভজসকাকে দেখে কর্নেল হেমবার মাষ্টার আনন্দিত হয়।

ভজসকাকে সামনের চেয়ারে বসায়।

খুবই বিষণ্ণের সঙ্গে বলে, মণিকার যে কি হয়েছে, তা বুঝতে পাচ্ছি না।

দিন দিন মেয়েটা কি রকম যেন রক্ত শূন্য হয়ে পড়ছে।

কথা বলতেও মেয়েটার বোধ হয় কষ্ট হয়।

কর্নেল হেমবার মাষ্টারের অসহায় অবস্থা দেখে ভজসকা নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারে না।

কর্নেল হেমবার মাষ্টারের ওপরে মাথা হয়

কিন্তু কিছু বলতে না পারায় তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

করনেল হেমবার মাষ্টার এবার আর্তনাদ করে ওঠে।

বলে, আচ্ছা ভজসকা তুমি তো বেশ কিছুদিন ধরে মণিকাকে দেখছো?

—হ্যাঁ স্যার।

—আচ্ছা বলতে পার, মণিকার কি হয়েছে? অনেক ডাক্তার দেখালাম। ডাক্তাররা কোন রোগ ধরতে পাচ্ছে না। তা হলে কি আমার একমাত্র সন্তান মণিকা বাঁচবে না?

এরপর ভজসকার নিজের মনকে শক্ত করে।

ভাবে, ভাগ্যে যা আছে, তা হোক।

সে কিছুতেই চুপ করে থাকবে না।

সে সব কথা কর্নেল হেমবার মাষ্টারকে খুলে বলবে।

সে কিছুতেই এভাবে দুটো প্রানীকে মরতে দিতে পারে না।

ভজসকা কঠিন হয়ে ওঠে

সে মন থেকে জড়তা দূর করে

সোজাসুজি কর্নেল হেমবার মাষ্টারের চোখের দিকে তাকায়।

বলে, আমি একটা কথা বলবো বলবো করে কিছুতেই বলতে পারছিলাম না।

সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল হেমবার মাষ্টার ব্যস্তভাবে বলে, কোন কথা ভজস্কা ?

—বলছিলাম কি, আপনার বাড়ীর চারদিকে যে রকম অমঙ্গলের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, তাতে আর চুপ করে থাকা ঠিক হবে না।

—বেশ তো। কি বলতে চাইছো, বল।

—আপনি যে পুতুলটা উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন, সেই পুতুলটা বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, তা দিয়েছিলাম।

—আসলে পুতুলটার তেমন গুরুত্ব না দেওয়ায়, পুতুলটা বাড়ীর ঝি ওর বাচ্চাদের খেলার জন্য নেয়।

কিন্তু বাড়ীতে যাবার আগেই পুতুলটা মনিকা দেখতে পায় জোর করে ঝি-এর কাছ থেকে নেয়।

তারপর থেকে মণিকা পুতুলটার সঙ্গে খেলা করে। সব সময় পুতুল সে কাছে রাখে।

অনেক চেষ্টা করেও আমরা পুতুলটা মণিকার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারি না।······

ভজস্কার বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই কর্নেল হেমবার মাষ্টার আর্তনাদ করে ওঠে।

বলে, তোমরা আমার কত বড় সর্বনাশ করলে, তা তোমরা বুঝতে পারনি।

আমার একটা মাত্র মেয়েকে একটা পুতুল কিনে দেবার মত আমার অবস্থা নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু মণিকা কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও ওকে পুতুল কিনে দিইনি।

তার কারণ, মণিকাকে পুতুল দেওয়া বারণ। পুতুলই একমাত্র মণিকার ক্ষতি করতে পারে।

আর এই পুতুলটাকে পুড়িয়ে না ফেলে অসহায় মা মরা মণিকার বাঁচার সব রকম পথ তোমরা বন্ধ করে দিয়েছো।

ওকে হয়ত আমরা কেউ বাঁচাতে পারবো না।

ডজসকা কর্নেল হেমবার মাষ্টারকে সান্ত্বনা দেয়।

বলে, আজকে রাত্রে মণিকা ঘুমিয়ে পড়লে, আপনাকে মণিকার ঘরে নিয়ে যাব।

কর্নেল হেমবার মাষ্টার কপাল চাপড়ে আর্তনাদ করতে থাকে।

বলে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে ডজসকা।

এখন মণিকার ঘরে কি যে দেখবো, তা একমাত্র পরম পিতাই জানেন।

গভীর রাত্রে কাঁটগাছের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাবার সময় রোমাঞ্চকর শব্দের সৃষ্টি করে।

ঘরের মাঝখানে বারান্দায় কালো কয়েকটা ছায়া পড়েই সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়।

ডজসকা নিঃশব্দে কর্নেল হেমবার মাষ্টারের ঘরের দরজায় আসে।

ইশারা করে কর্নেল হেমবার মাষ্টারকে ডাকে ও অনুসরণ করতে বলে।

দুজনে খুবই সন্তর্পণে মণিকার ঘরের সামনে আসে।

দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে, ঘুমন্ত মণিকার পাশে পুতুলটা শুয়ে।

পুতুলটার ভেতর থেকে কালো আলখাল্লা পড়া একটা বিকট পিশাচ মূর্তি বেরিয়ে আসে।

ঘরে তুষার ঝড় বইতে শুরু করে

পিশাচ মূর্তি দু হাত দিয়ে নিজের ঝাকড়া চুল সামলায়।

পরে মণিকার দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়ায়।

বলে, আজকে তোমার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার শেষ দিন।

তোমার বাবা অর্থাৎ কর্নেল হেমধার মাষ্টার যুদ্ধে আমার স্ত্রীকে তিল তিল কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছিল।

আমার একমাত্র শিশু কন্যাটি মায়ের দুধ না পেয়ে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

আমার মৃত স্ত্রীর ও কন্যার মৃত দেহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে করে হোক, যত কষ্ট করে হোক আমি পিশাচ তন্ত্র সাধনায় সফল হব।

সেই তন্ত্রের সাহায্যে তোমার বাবা যেমন আমার জীবনটাকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে, আমিও তার ওপর প্রতিশোধ নিয়ে আমার বুকের জ্বালা দূর করবো।

তাই আমার মৃত কন্যার খেলনার পুতুলকে পিশাচ বানিয়ে তোমার বাবার কাছে চালাকি করে পাঠাই।

সে জন্যই তোমার বাবা তোমাকে কোন পুতুল কিনে দিত না।

তোমার বাবা আমার গতিবিধি জানতো বলে, আমার পাঠানো অনেক পুতুলই সে প্রত্যাখান করে।

আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এবার আর সে তেমন কায়দা করতে পারে না।

আমি সাফল্য মণ্ডিত হই।

এবার আমি আমার এতদিনকার ইচ্ছে রসিয়ে রসিয়ে পূরণ করব।

কাজেই, মণিকা এবার তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত অবস্থায় ক্লান্ত স্বরে মণিকা আবদারের ভঙ্গিতে বলে, আহা, আমি তো তোমাকে কত ভালবাসি। তাছাড়া, আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি। তবে তুমি আমাকে মারবে কেন?

পিশাচ মূর্তির লোকটা ফ্যাস ফ্যাস করে হেসে ওঠে।

বলে, আমার স্ত্রী ও কন্যাও নিরপরাধ ছিল। তবে তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল কেন?

না, না, আর সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়।

তোমাকে এখন মরতেই হবে মণিকা। আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।

পরক্ষণে পিশাচ মূর্তির লোকটা ঘুমন্ত মণিকার উপরে ঝাপিয়ে পড়ে। মণিকার টুঁটি মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল হেমবার মাষ্টার মণিকার ঘরে ঢোকে।

পিশাচ মূর্তি লোকটাকে লক্ষ্য করে হাতের রিভালভার থেকে পরপর দুটো গুলি ছোড়ে।

গুলি দুটো পিশাচ মূর্তি লোকটার দেহের মধ্যে দিয়ে ঢুকে ঘরের দেয়ালে সশব্দে আঘাত করে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কুয়াশার ঝড় যেন আরও বেড়ে যায়।

তারই মধ্যে পিশাচ মূর্তির লোকটা কর্নেল হেমবার মাষ্টারের ওপরে ঝাপিয়ে পড়ে।

তার হিংস্র দাঁতের কামড়ে কর্নেল হেমবার মাষ্টারের মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করে দেয়।

পরে কর্নেল হেমবার মাষ্টারের গলার ক্ষতস্থানে মুখ রেখে রক্ত পান করতে থাকে সে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পিশাচ মূর্তি লোকটা মণিকার স্থির দেহটার ওপরে নজর ফেলে।

আনন্দে তার বিভৎস মুখখানা আরও বিভৎস হয়ে ওঠে।

সে চিৎকার করে বলে, প্রতিশোধ, হ্যাঁ প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। আমার শত্রুর বংশে আলো দেবার জন্য কেউই রইল না

আজকে আমার মত আনন্দিত লোক বোধ হয় খুবই কম আছে।

পরের দিন সকালে ডক্সস্কা, ওরাইলী প্রভৃতিরা মণিকা ও কর্নেলের মৃতদেহ দুটো নিয়ে বসে থাকে লোকজন আসার অপেক্ষায়।

ডক্সস্কাদের দেখে মনে হয়, ওরাও হয়ত বেঁচে নেই। নশ্বর দেহগুলো নিয়ে উপস্থিত হয়েছে মহাশান্তিময় গোরস্থানে।

রাতের আগন্তুক

লর্ড হ্যালি ক্যাম্প

সময়টা ছিল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক শরৎকালের শেষের দিক।

আমরা সপরিবারে বিদেশ ভ্রমণে বেরুই।

কয়েকদিন নানান জায়গায় বেড়িয়ে শেষে আমরা 'কীকে' শহরে এলাম।

শহরটা আমাদের বেশ ভাল লাগলো।

বাবা ও মা ঠিক করল যে, এখানে আমরা কয়েকদিন কাটিয়ে যাব।

তাই বাবা শহরের বাইরে একটা বাড়ী নেয়।

কিন্তু বাড়ীটা তেমন সুবিধের ছিল না।

তাই বাবা বাড়ীটা পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করে।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা একটা মনের মত বাড়ী পাই।

বাড়ীটা বেশ বড় ও খোলামেলা। ভাড়াটাও বাড়ীর তুলনায় খুবই কম।

কাজেই, আমরা সকলে খুবই আনন্দিত হই।

হৈ হৈ করে আমরা সকলে বাড়ীর জিনিষ পত্র নিয়ে নূতন বাড়ীতে আসি।

নূতন বাড়ীতে এসে আমাদের কি রকম যেন অস্বস্তি হতে লাগলো।

কেননা, রোজ গভীর রাত্রে আমাদের ঘরের উপরকার ঘরে কে যেন শব্দ করে ঘুরে বেড়ায়।

প্রথমে আমরা মনে করি, বাড়ীর চাকর ঝিরা বোধ হয় রাত্রে ঘুম না আসার জন্য ফাঁকায় পায়চারী করে।

দু একদিন পরে মা তার নিজস্ব চাকরানী ক্রেশওয়েলকে আড়ালে ডাকে।

বলে, আচ্ছা, আমাদের ঝি চাকরদের মধ্যে কেউ কি নিশুতি রাতে দোতলার ঘরে পায়চারী করে ?

ঝি ক্রেশওয়েল আকাশ থেকে পড়ে।

বলে, সে কি গিন্নী, দোতলার ঘরে আবার কে নিশুতি রাতে চলা ফেরা করবে ? দোতলার ঘরটাতো তালা বন্ধ করা। ওটা তো চিলেকোটা।

তারপর এসব ব্যাপার নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাই না।

কয়েক সপ্তাহ পরে মার সঙ্গে আমি ব্যাঙ্কে যাই কিছু টাকা তোলার জন্য।

ব্যাঙ্কের কেশিয়ার আমাদের অনেকগুলো খুচরো দেয়।

খুচরোগুলো নিয়ে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তাই ব্যাঙ্কের কেশিয়ার আমাদের জানায় যে, আমরা আমাদের বাড়ীর ঠিকানা জানালে সে আমাদের খুচরো পয়সাগুলো ব্যাঙ্কের লোক দিয়ে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেবে।

আমাদের বাড়ীর ঠিকানা জানাই।

আমাদের বাড়ীর ঠিকানা শুনে ব্যাঙ্কের কেশিয়ার ভয় পায়

নিজের বুকের ওপরে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে।

বলে, সর্বনাশ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মা প্রশ্ন করে, সর্বনাশ কি হয়েছে ?

—সর্বনাশ হয়েছে আপনাদের বাড়ী নিয়ে।

—আমাদের বাড়ী নিয়ে।

—হ্যাঁ। ও বাড়ীটা লোকে বলে ভূতের বাড়ী। রাত্রে ভূতেরা

ও বাড়ীতে জড় হয়। নিজেদের খেয়ালখুশী মত চলাফেরা করে। কেউ এ বাড়ীতে ভাড়া আসতে চায় না।

মা কেশিয়ারের অবস্থা দেখে হো হো করে হেসে ওঠে।

মাকে ও ভাবে হাসতে দেখে ব্যাঙ্কের লোকেরা অবাক হয়।

বলে, আপনি হাসছেন কেন? আপনার বোধ হয় বিশ্বাস হচ্ছে না?

মা বেশ জোরের সঙ্গে বলে, ঠিক তাই। ওসব আপনাদের মনের ভুল। আমি ওসব মানি না।

—তা হলে যারা রাত্রে ঘুরে বেড়ায়?

—আপনাদের ভয় দেখাবার জন্য এসব চালাকি করা হয় নিশ্চয়ই।

এরপর আরও কয়েকটা দিন কেটে যায়।

সেরকম কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে না।

ঠিক দশদিনের দিন মার খাস ঝি ক্রেশওয়েল হাউ মাউ করে মার কাছে আসে।

বলে, বাড়ীর ফরাসী ঝি চাকরেরা আর এক দিনের জন্য এবাড়ীতে থাকতে চায় না।

ক্রেশওয়েলের কথায় মা অবাক হয়।

বলে, সাত সকালে তোদের কি হয়েছে?

—ব্যাপারটা হল, ওরা পাড়ার লোকের কাছে শুনতে পেয়েছে যে, এ বাড়ীটা ভূতের বাড়ী

মাও ধমক দেয় ক্রেশওয়েলকে।

বলে, যত সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা আমার ভাগ্যে জুটেছে। তোদের কি একটুও বুদ্ধি হবে না?

ক্রেশওয়েল আমতা আমতা করে বলে, পাড়ার লোকেরা বলেছে, এককালে এবাড়ির মালিক ছিল একটা ফরাসী যুবক।

সম্পত্তির লোভে তার কাকা তাকে একটা লোহার খাঁচায় পুরে

খুন করে। খাঁচা সমেত যুবকটির মৃতদেহ এ বাড়ীতেই রেখে যায়।

পাড়ার লোকেরা বলছে, এবাড়ীতে কোন লোকই দু-একদিনের বেশী থাকতে পারে না।

আমাদের সাহস খুব বেশী। তাই আমরা এতদিন ধরে এ বাড়ীতে আছি।

ক্রেশওয়েলকে সাহস যোগাবার জন্য মা সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখে।

বলে, আমার কাজের লোক হয়ে তুই আজ বাজে কথা বিশ্বাস করবি ?

ক্রেশওয়েল প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়ে।

বলে, আমি কি সহজে বিশ্বাস করছি।

একবার ওপরের ঘরে চলুন না। এখনও সেই লোহার খাঁচাটা ঘরের মধ্যে আছে।

এ সময়ে আমাদের বাড়ীতে একজন পরিচিত ভদ্রলোক বেড়াতে আসেন।

তাকেও সঙ্গে নিয়ে আমরা আমাদের বাড়ীর দোতলার চিলে কোঠায় যাই।

ঘরটা ঠিক চিলেকোঠার মত নয়।

ঘরটা চওড়ায় চার পাঁচ ফুট। লম্বায় আট ফুটের মত।

এ সব লোহার খাঁচায় সাধারণত জন্তু জানোয়ারদের রাখা হয়।

খাঁচাটা একটা আংটা দিয়ে ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো দেখতে পাই।

অনেকদিন ব্যবহার না করায় লোহার আংটাটায় বেশ মরচে ধরেছে।

সব দেখে মাও কিছু বলতে পারে না।

আমরা সকলে ভয়ে শিউরে উঠি।

কেননা, এভাবে কোন মানুষকে কোন সুস্থ মানুষ মারতে পারে!

তবুও ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারি না।

ঝুঁকি নিতেও মন চায়।

তাই মনে মনে ভাবি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ বাড়ী থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচি।

তারও দিনদশেক পরে একদিন সকালে ক্রেশওয়েলকে দেখে সন্দেহ হয়।

ওকে প্রশ্ন করি, কি হয়েছে ক্রেশওয়েল?

আমার কথায় ক্রেশওয়েল কেঁদে ফেলে।

বলে, আমি আর কোনদিন ওপরের ঘরে রাত কাটাবো না দিদি।

—কেন, কি হয়েছে?

ততক্ষণে মা চলে আসে।

মা কোন প্রশ্ন না করেই বলে বেশতো। তুই ও মার্স আমার ঘরের পাশের ছোট ঘরে থাকবি।

তোদের আর ওপরের ঘরে থাকতে হবে না।

তবুও আমি ক্রেশওয়েলকে প্রশ্ন করি, কেন, কি হয়েছিল তোমাদের?

—কাল রাত্রে কে যেন আমাদের ঘরে ঢুকেছিল।

আমি ও মার্স ভয়ে কুঁচকে গিয়েছিলাম।

দুজনেই দুটো চাদর মুড়ি দিয়ে কোন রকমে রাতটা কাটাই।

ক্রেশওয়েলের হাব ভাব দেখে আমার হাসি পায়।

আমি বলি, তোমাদের যে ঘরটা দেওয়া হয়েছিল, তার পেছনে আরও একটা দরজা আছে।

সে দরজা খোলা থাকার জন্য কেউ হয়তো তোমাদের ভয় দেখিয়েছে।

সে ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর একদিন রাত্রের খাবার পর

আমাকে ও ভাই চার্লসকে মার ঘর থেকে এমব্রয়ডারী ফ্রেমটা আনতে বলে।

ঘরের বাইরেটা ভীষণ অন্ধকার থাকলেও সিঁড়ির আলো জ্বালা ছিল।

সে জন্য আমরা মোমবাতি না নিয়ে মার ঘরের দিকে যাই।

সিঁড়ির নিচ দিয়ে যাবার সময় মনে হয় ওপরে কে যেন চলা ফেরা করছে।

ভাল করে ওপর দিকে তাকাই।

দেখি, পাতলা গাউন পরা ও লম্বা চুলওলা কে যেন সত্যিই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে!

আমি ও চার্লস ভাবলাম, আমাদের চাকর হান্না বোধ হয় আমাদের ভয় দেখাবার জন্য দোতলার সিঁড়ির কাছে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

চার্লস হান্নার এ জাতীয় আচরণে রেগে যায়।

বেশ জোরের সঙ্গে বলে, এভাবে আমাদের ভয় দেখালে আমরা কিন্তু মাকে সব কথা বলে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়ামূর্তি ক্রেশওয়েল ও মার্সের আগের যৌথ কবে ঢুকে যায়।

চার্লসও হান্নাকে ধরার জন্য সে ঘরে উঁকি মারে।

কিন্তু ঘরে কাউকে দেখতে পায় না।

আমরা মনে করি, ঐ ঘরের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে হয়ত হান্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

এমব্রয়ডারী ফ্রেম নিয়ে মার কাছে আসি। হান্নার দুষ্কর্মের কথা সব মাকে বলি।

মা রেগে যায়।

বলে, এ কি জাতীয় অসভ্যতা? ও তো অনেকক্ষণ আগে মাথা ধরেছে বলে ছুটি নিয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা হান্নার ঘরে যাই।

দেখি আমাদের আর একজন কাজের লোক এ্যালিক হান্নার ঘরে বসে কাজ করছিল।

এ্যালিক জানায় যে, হান্না ঘন্টাখানেক ধরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে ঘর থেকে বেরোই নি।

ক্রশওয়েল আমাদের কথা শুনে কান্না জুড়ে দেয়।

বলে, দাদাবাবু ও দিদিমণিও আমাদের মত তেনাকে দেখেছে! এখন আমাদের কি হবে গো?

আমরা ক্রশওয়েলকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করি।

সেদিন আমার ভাই হ্যারি আমাদের বাড়ীতে থাকবার জন্য আসে।

হ্যারির থাকার জন্য ঘর ঠিক হয় সিঁড়ির ওপরের ঘরটা।

পরের দিন সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট খেতে বসে হ্যারি উত্তেজিত হয়ে উঠে।

মাকে বলে, গতকাল রাত্রে আমি মাতাল ছিলাম কিনা, কিংবা ঘরের আলো নেভাবার সামর্থ ছিল কিনা, তা পরিষ্কার করার জন্য একজন গোয়েন্দাকে আমার পেছনে লাগিয়েছিলে?

অবশ্য ঘরের দরজার কড়া নাড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।

চাঁদের আলোয় দেখি, ঢিলে গাউন পরা একজন লোক ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোকের ভাগ্য ভাল ছিল।

তা না হলে হাতের কাছে যদি সে রকম কিছু পেতাম, তা হলে তখনই ওকে বুঝিয়ে দিতাম, আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করার ফল কি হয়।

হ্যারির কথায় মা কোন উত্তর দেয় না।

সে যেন কি রকম মুষড়ে পড়ে।

হ্যারিকে শুধু বলে, তোমার সম্পূর্ণ ধারণা ভুল হ্যারি।

পরের দিন আমাদের আর এক পরিচিত পরিবারের শ্রী ও শ্রীমতী এ্যাটকিনস ছেলে কোলে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসে।

শ্রী ও শ্রীমতী এ্যাটকিনস থাকে "লীলে" থেকে প্রায় চার মাইল দূরে।

আমাদের বাড়ীর ঘটনা শুনে শ্রীমতী এ্যাটকিনস্ আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

বলে, এত বড় এ্যাডভেঞ্চার হাতছাড়া করা আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।

তারপরেই সে মাকে অনুরোধ করে অন্তত পক্ষে একটা রাত্রির জন্য তাকে ও তার প্রিয় কুকুরটাকে ফ্রেশওয়েল এর আগের শোবার ঘরে থাকার অনুমতি দিতে।

মা শ্রীমতী এ্যাটকিনসকে অনেক ভাবে বুঝিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিতে বারণ করে।

কিন্তু শ্রীমতী এ্যাটকিনস একেবারে নাছোড়বান্দা।

কিছুতেই সে তার সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে চায় না।

বারংবার মাকে অনুরোধ করে একটা রাত্রি আমাদের বাড়ী তাকে ও তার কুকুরটা সমেত থাকতে দিতে।

অগত্যা মা শ্রীমতী এ্যাটকিনসের প্রস্তাব মেনে নেয়।

শ্রীমতী এ্যাটকিনসের অনুরোধে তার স্বামী শ্রী এ্যাটকিনস শ্রীমতী এ্যাটকিনসের রাত্রের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনতে নিজের বাড়ীতে ছোটে।

পরের দিন সকালবেলা সকলের ঘুম থেকে ওঠার আগে শ্রীমতী এ্যাটকিনস ঘুম থেকে ওঠে।

বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে কুকুর নিয়ে বসে থাকে।

শ্রীমতী এ্যাটকিনসকে দেখে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি।

শ্রীমতী এ্যাটকিনসের এক রাত্রেই চোখের কোলে কালো দাগ হয়েছে।

ক্লান্তিতে মুখখানা যেন ঝুলে পড়েছে।

মা শ্রীমতী এ্যাটকিনসকে খাবার ঘরে নিয়ে আসে।

তাড়াতাড়ি তাকে সকালের খাবার দেয়।

পরে প্রশ্ন করে, গতরাত্রে কি ভাল ঘুম হয়নি শ্রীমতী এ্যাটকিনস ?

—না, সে রকম হয়নি। বেশ চিন্তিতভাবে শ্রীমতী এ্যাটকিনস উত্তর দেয়।

—ভয়-টয় পেয়েছিলেন কি ?

শ্রীমতী এ্যাটকিনস বেশ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

বলে, প্রথম রাত্রে বেশ স্বাভাবিক ঘুম হয়েছিল।

হঠাৎ কারও পায়ের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

আমার মনে হয়, কে যেন আমার শোবার ঘরে ঢুকেছে।

আমার কুকুরটা সাধারণতঃ অচেনা লোকজন দেখলেই ডেকে যায়।

কিন্তু গত রাত্রে তার ঠিক ব্যতিক্রম দেখলাম।

পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে কুকুরটাকে লেলিয়ে দিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু কুকুরটার তরফ থেকে সে বিষয়ে কোন উৎসাহ লক্ষ্য করি না।

সে যেন আরও জড় সড় হয়ে যায়।

ভয়ে সে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে।

শ্রীমতী এ্যাটকিনস সাময়িকভাবে চুপ করলে শ্রী এ্যাটকিনস হেসে ওঠে।

বলে, একেই বলে মেয়েছেলের বুদ্ধি

কোন কিছু থাকলেই তবে না কুকুরটা ডেকে যাবে।

যত সব কুসংস্কার।

তারপরে আর শ্রীমতী এ্যাটকিনস আমাদের বাড়ীতে থাকে না।

মি: এ্যাটকিনসকে নিয়ে নিজেদের বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

শ্রী ও শ্রীমতী এ্যাটকিনস আমাদের বাড়ী থেকে চলে যেতে মা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বলে, ও সব ভূত টুত আমি বিশ্বাস করি না।

তবে সকলে যখন বড়ীটাকে বদনাম দিচ্ছে, তখন আর এ বাড়ীতে থাকা উচিত নয়।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

চার্লস ফুট কেটে বলে, এ বাড়ীর রহস্য উদঘাটন হবার আগেই আমরা এ বাড়ী ছেড়ে যাব না ?

সঙ্গে সঙ্গে মাও ফুঁসে ওঠে!

বলে, মাথায় থাক এ বাড়ীর রহস্য।

আমি এখনও চিন্তা করে পাচ্ছি না যে, গভীর রাতে আমার ঘরে একজন পায়চারি করবে, আর আমি চোখ বড় বড় করে দেখবো, এ কথা যেন ভাবাই যায় না।

কয়েকদিনের মধ্যে অনেক চেষ্টা করে বাবা একটা বাড়ী ঠিক করে।

বর্তমান বাড়ী ছাড়ার তিন দিন আগে রাত্রে ভীষণ গরম হওয়ার জন্য আমরা আমাদের শোবার ঘরের আমাদের খাটের পাশে ও পায়ের দিকের জানালাটা খুলে দিয়েছিলাম।

রাত্রে আমাদের ঘরে একটা আলো রোজই জ্বলে

সারাদিন পরিশ্রম করার রাত্রে ভীষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

গভীর রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

এতদিনে পায়ের শব্দ আমাদের কানে সয়ে গিয়েছিল।

আমাদের ভয় কিংবা ঘুম ভাঙতো না।

আজকের রাত্রে পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙ্গে না।

আমার মনে হয়, কে যেন ঘরে ঢুকেছে।

আমি ভাল করে চোখ খুলে ঘরের আলোতে সমস্ত ঘরের ওপরে চোখ বোলাই।

আমাদের শোবার ঘরে জানালা ও দরজার সঙ্গে মাপ করা বিরাট একটা দেরাজওলা সিন্দুক ছিল।

সেই সিন্দুকটার ওপরে হাত রেখে একটা রোগা ছিপ্‌ছিপে যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।

যুবকটি অস্বাভাবিক লম্বা, রোগা ও ঢিলে গাউন পরা ছিল।

যুবকটি বিষণ্ণ ও মরার মত পলক হীন চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকায়।

সে চোখ যে কি ভয়ঙ্কর, তা একমাত্র আমিই অনুভব করতে পারি।

সে দৃশ্য দেখার প্রায় ঘণ্টাখানেক ভয়ে চোখ খুলতে পারি না।

আমিও মরার মত চুপ করে শুয়ে থাকি।

তারপর যখন আমি চোখ খুললাম, দেখলাম ঘরের আলো একই রকমভাবে জ্বলছে। কিন্তু ঘরে কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

ভাবলাম, ঝি বোধ হয় ঘর থেকে যাবার সময় ঘরের দরজা ভাল করে বন্ধ করেনি।

তাই হয়ত কেউ আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিল।

কিন্তু ঘরের দরজা পরীক্ষা করে দেখি, না, সেগুলো রোজের মতই বন্ধ ছিল।

পরে বাকি রাতটুকু ঘুমুতে পারি না।

পরের দিন সকালে মাকে গত রাত্রের সব কথা বলি।

মা তো আঁৎকে ওঠে।

বলে, তখন আমাকে না ডেকে ভালই করেছিস।

তা না হলে ও দৃশ্য দেখে আমিই হয়ত হার্টফেল করতাম।

তারপর আর মা একদিনও সে বাড়ীতে থাকতে চায় না।

সেদিনই সে বাড়ী ছাড়বে বলে মনস্থ করে।

আমরা হাত চালিয়ে বাড়ীর জিনিষপত্র বেঁধে ফেলি

বাড়ী ছাড়ার আগে আমি ক্রেশওয়েল কে নিয়ে বাড়ীর আনাচে কানাচে দেখি।

ভাবি, নিশ্চয়ই বাড়ীতে এমন কোন গুপ্ত পথ আছে, যা দিয়ে রোজ গভীর রাত্রে কেউ আমাদের বাড়ীতে ঢোকে। আমাদের সকলকে আতঙ্ক গ্রস্থ করে তোলে।

অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও আমরা সে রকম গুপ্তপথের সন্ধান পাই না।

তবে সে দিনই আমরাবাড়ী ছেড়ে চলে যাই।

এর কিছুদিন পরে এ ঘটনাকে অবলম্বন করে লেখক ব্যারিং গোল্ড "কর্নহিল" পত্রিকায় একটা সুন্দর ভৌতিক গল্প লেখে।

লেখা প্রকাশের কয়েকদিন পরে লেখও ব্যারিং গোল্ড এর কাছে একটা চিঠি আসে।

পত্র লেখক লিখেছে,

প্রিয় ব্যারিং গোল্ড মহাশয় সমীপেষু,

"কর্নহিল" পত্রিকায় আপনারভৌতিক গল্পটা পড়লাম। লেখাটা সত্যিই আমার মনকে নাড়া দিয়েছে। কারণ বিগত তিরিশ বছর আগে "ডিউ-সায়ন-ডি-অর" নামে একটা হোটেলে ঠিক এ রকম আমারও অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

আমি আমার দু বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাউলং থেকে ব্রাসেলসে যাচ্ছিলাম। আমার দু বন্ধুর মধ্যে একজন ছিলেন যথেষ্ট বৃদ্ধ। তাছাড়া দূরপাল্লার রেল ভ্রমণ সম্বন্ধে তার আগে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

কাজেই ট্রেন ভ্রমণে আমার সেই বৃদ্ধ বন্ধুটি খুবই কাহিল হয়ে পড়ে। ফলে তার বোন ঠিক করে "লীলে"-তে রাত কাটিয়ে শরীরের অবস্থা অনুসারে পরের দিন যাত্রা করা যাবে।

রেল ষ্টেশনের কাছে "হোটেল-ডিউ-সায়ন-ডি-অর" নামে

একটা হোটেলের দোতলা ঘরে আমরা থাকার সুযোগ পাই। অবশ্য আমার ঘরের সঙ্গে তারও একটা ঘর ছিল।

প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার পাশের ঘরে যাবার একমাত্র রাস্তা হল আমার ঘরের ভেতর দিয়ে।

কিন্তু ভাল করে ,লক্ষ্য করে দেখি যে, ওঘরে যাবার জন্য আরও একটা পথ আছে। বাড়ীওলা ভদ্র লোক অবশ্য ও ঘরের দরজা বন্ধ করার জন্য একটা চাবি দেয়।

প্রায় সকলে ক্লান্ত থাকায় আমরা যে যার ঘরে শুয়ে পড়ি।

আমার ঘুম না আসার জন্য ঘরের টেবিল চেয়ারে কয়েকটা দরকারী চিঠি লিখতে বসি।

এভাবে কতক্ষণ যে কেটে গিয়েছে তা আমার খেয়াল নেই। এক সময় মনে হয় কে যেন আমার ঘরে অন্যদিকের দরজা দিয়ে খুবই সাবধানে যাতায়াত করছে।

আমি ভাবলাম, হোটেলের চাকরেরা বোধ হয় অন্ধকারে চলা-ফেরা করছে।

একটু পরেই আমার ঘরের দরজাটা কে যেন বেশ জোরে নাড়িয়ে দেয়।

পাশের ঘরে আমার বান্ধবী ঘুমুচ্ছিল।

সে কড়ানাড়া শব্দে আমাকে প্রশ্ন করে। কি ব্যাপার, কোন অসুবিধে হচ্ছে না কি? সমস্ত রাতটা প্রায় বাড়ীর ওপর-নিচ করে কাটাচ্ছ।

আমি বান্ধবীকে বলি, আমি একটি বারের জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠিনি। কাজেই, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তারপর দুজনে আলো নিয়ে ঘরের বাইরেকার চাতালে আসি।

কিন্তু সেখানেও কাউকে দেখতে পাই না।

আমরা মনে মনে স্থির করি, শব্দটা কাছে শোনালেও, আসলে নিশ্চয়ই শব্দটা দূরে হচ্ছে।

আমাদের মনে হচ্ছে খুব কাছে কে যেন নিঃশব্দে চলাফেরা করছে।

পরেরদিন সকালবেলা আমরা সে হোটেলটা ছেড়ে দিই। নিজেদের গন্তব্য স্থানের দিকে যাই।

তারপরে ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভুলতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

এ ঘটনার প্রায় দু মাস পরে মার একজন বান্ধবী এ জাতীয় একটা রচনা মাকে পাঠায়।

রচনা পড়ে দেখা যায় ঘটনা ঘটেছিল "লীলে" নামে একটা জায়গার "ডউ-সায়ন-ডি-অর" নামে একটা হোটেলে।

সেখানেও লেখিকা পায়ের শব্দ শুনেছেন। কিন্তু কাউকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

এতগুলো লেখার কারণ হল, আগামী দিনে আপনি হয়ত সেই প্রেতপুরী সম্বন্ধে আরও তথ্যাবলী সংগ্রহ করে পাঠক মহলকে আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

নমস্কারান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

অঃ সঃ

। সমাপ্ত ।